ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ।

অর্থাৎ

সঙ্গীতাকারে যাহা ব্রহ্মসমাজে
অভিব্যক্ত।

ব্রহ্মের পবিত্রধাম বিশাল ভুবন।
চেতঃ পূত তীর্থ, সত্য শাস্ত্র সনাতন॥
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, প্রীতি যে সাধন।
বৈরাগ্য, ত্যজিলে স্বার্থ, কহে ব্রাহ্মগণ॥

'জীবের সাধন গৌর সিদ্ধি ঈশা, নূতন বিধানে।' (বিধান সঙ্গীত)

৩৫নং বিধানপল্লী হইতে
শ্রীদিগিন্দ্রলাল সেন কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩৩৯ সাল।

মূল্য ৫০ আনা।

ঢাকা
আলেক্জাণ্ড্রা ষ্টীম মেসিন প্রেসে
শ্রীসেক আবদুলগণি কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



ওঁ তৎসৎ

ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ।

প্রথম অধ্যায়।

ভূমিকা।

আমরা এই পূর্ব্ববঙ্গে ইতিপূর্ব্বে এমন কোন সাধু মহাজন বা সাধকের কথা শুনি নাই যিনি বিশেষভাবে যোগ সাধন বা ভক্তি সাধন করিয়া সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। শৈশবে শুনিতে পাইয়াছিলাম রামপ্রসাদ মাতৃভাবে আদ্যাশক্তি ভগবতী জগজ্জননীর সাধন ভজন করিয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ-রচিত শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত বঙ্গের আপামর সর্ব্বসাধারণেই গাইয়া থাকেন এবং রামপ্রসাদের সিদ্ধি সম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তিও শুনা গিয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ যে এই পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না, তাহাও লোক-মুখেই শুনা যাইত। রাজা রামকৃষ্ণ জয়কালীর পূজা দিয়া ভক্তি বিগলিত হৃদয়ে সঙ্গীত-যোগে তাঁহার উপাসনা করিয়াছেন, ইহাও অনেকের মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু রাজা রামকৃষ্ণও পূর্ব্ববঙ্গের লোক ছিলেন না।

তিনি নাটোরের সুপ্রসিদ্ধা রাণী ভবানীর দত্তক পুত্র ছিলেন। পূর্ব্বাঞ্চলে অর্থাৎ মেঘনার পূর্ব্বপারে দেওয়ান রামদুলাল মুন্সী শ্যামা ভক্ত ছিলেন ও তাঁহার রচিত অনেক সঙ্গীত আছে, ইহাও আমরা প্রথম যৌবনেই শুনিয়াছিলাম। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ বলিতে আমরা যাহা মনে করি তাহার মধ্যে কোন সুপ্রসিদ্ধ ভক্ত, কি সাধক জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এরূপ শুনা যায় নাই। পূর্ব্ববঙ্গের সীমা আমরা এইরূপে নির্দ্দেশ করি। উত্তরে গারোপাহাড়, পূর্ব্বে মেঘনা নদী, দক্ষিণে পদ্মা, পশ্চিমে যমুনা অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র এই নামে তীস্তা প্রভৃতি নদীর সহিত মিলিয়া, পদ্মার সহিত এক হইয়াছে। আমরা যে সীমা নির্দ্দিষ্ট করিলাম ইহা শুধু ময়মনসিংহ ও ঢাকা জেলার সীমা। এই দুই জিলা মধ্যে এমন কোন ভক্ত সাধকের নাম আমাদের শ্রুতি গোচরে আসে নাই যিনি কোন রূপ বিশেষ সাধন ভজন দ্বারা সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন। এই দুই জেলার জমিদারগণ এবং অন্যান্য ভদ্রলোকগণ অধিকাংশই শাক্ত। শাক্ত হইলেও সাধন ভজনের বিশেষত্ব তাঁহাদের মধ্যে শুনা যায় নাই, অন্ততঃ আমরা তাহা জানি না। ব্যবসায়ী, ধনী ও মধ্যবিত্ত লোকদিগের মধ্যে অনেকে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বিশেষভাবে তাহাদের কেহ ভক্তি সাধন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন তাহাও জানা যায় না। বস্তুতঃ এদেশে কেহ যোগী অথবা ভক্ত হইয়াছেন এরূপ কথা আমরা শুনি নাই। এজন্য কিন্তু আমরা বলিতে পারি না, যে এদেশে লোকের মধ্যে ভক্তির

ভাব অথবা যোগের ভাব একেবারেই ছিল না। সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, নিত্য সনাতন রূপে চিরকালই আছেন এবং প্রতি মানবের হৃদয়ে বাস করিয়া আপনার লীলারস আস্বাদন করিতেছেন, সুতরাং লোক-চক্ষের অন্তরালে থাকিয়া তাঁহার কার্য্য তিনি করিয়া আসিতেছেন। স্থানে স্থানে মুসলমান সাধকের দর্গা আমরা দেখিতে পাই, তাহা হইতেও বলা যায় যে অনেক মুসলমান সাধু এবং সাধক এদেশে হইয়া গিয়াছেন। একটী হিন্দু রমণীর নামও আমরা শুনিয়াছি। তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া পারা যায় না। আটিয়াতে সান্সার দরগা একটী প্রসিদ্ধ বস্তু। ঐরূপ আরও মুসলমান সাধুর দর্গা আছে, কিন্তু তাঁহাদের সাধন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু অবগত নহি। যে হিন্দু রমণীর উল্লেখ করা গেল, তিনি ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নবাবগঞ্জ থানার ঝাউকাঁদা গ্রামে বাস করিতেন। অনেকে মৈনট ষ্টীমার ষ্টেশন দেখিয়াছেন। ঐ মৈনট গ্রামের নিকটেই ঝাউকাঁদা গ্রাম ছিল, তাহা এক্ষণে পদ্মাগর্ভে। ঐ গ্রামে মহারাণী নামে এক কর্ম্মকার কুলোদ্ভবা মহিলা যৌবনের প্রারম্ভেই অলৌকিক ধর্ম্মভাবের বশবর্ত্তিনী হইয়া চিরকুমারী থাকেন এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মজীবন যাপন করিয়া লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেন। এ অবস্থায় সচরাচর যাহা হইয়া থাকে, তাঁহার সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার আন্তরিক ধর্ম্মভাবের পরিচয় বড় কেহ লয় নাই, শুধু ব্যারাম পীড়া হইলেই তাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য লোক সকল তাঁহার নিকট আসিত, এবং তিনিও তাহাদিগকে

রোগ আরোগ্যের উপযোগী ঔষধ ব্যবস্থা করিয়া বিদায় দিতেন। এই প্রসঙ্গে একটী বৈষ্ণব ভক্তেরও নাম এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই ভক্ত বৈষ্ণব আর কেহ নহেন, নব বিধান ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক স্বর্গীয় ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগীর মাতামহ, এবং পরম শ্রদ্ধাস্পদ সাধক স্বর্গীয় হরিসুন্দর বসুর খুল্লতাত। তাঁহার নিবাস চকমীরপুর ছিল। এইরূপ গণেশ বাবাজি ও অন্যান্য সাধুর নাম করা যাইতে পারে। ভগবান্ এইরূপ স্থানে স্থানে সাধুভক্ত লইয়া স্বয়ং আপনার প্রেমরস শুধু আস্বাদন করেন তাহাই নহে, তদ্দ্বারা সাধারণ লোকের মধ্যেও ভক্তির ভাব বিস্তার করিয়া প্রতি হৃদয়ে প্রেমলীলার অভিনয় করিয়া থাকেন। সাধারণ ভাবে তিনি চিরকাল ইহা করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন। এইরূপ সাধু জীবন অসংখ্য থাকিলেও তদ্দ্বারা তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ তেমন করিয়া হয় নাই, যেরূপ এক একটী **বিধানের ব্যাপারে** তাহা হইয়াছে।

নববিধানের সমাগমে এই পূর্ব্ববঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ এক অতি অভূতপূর্ব্ব মহা ব্যাপার। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্রের জীবনে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং করিবেন। কিন্তু এই পূর্ব্ববাঙ্গলাতে, বিশেষতঃ, সাধারণতঃ যে দেশকে পাণ্ডববর্জ্জিত-দেশ বলিয়া মানুষ অহরহ কটাক্ষ করিয়া থাকে, সেই দেশে এমন একজন আবির্ভূত হইলেন, যাঁহার মধ্যে বেদ প্রতিপাদ্য **তুরীয় ব্রহ্ম**, বেদান্ত প্রতিপাদ্য **পরমাত্মা** এবং পুরাণোক্ত **ভগবান্**—ঈশ্বরের এই ত্রিবিধ দর্শন হইয়াছে এবং

ব্রহ্মস্বরূপের বিশেষ বিশেষ প্রকাশও হইয়াছে। একথা কাহারও হয়ত তেমন বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি না হইতে পারে। কিন্তু যেরূপ অগ্নি কেহ বস্ত্র দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে পারে না, জলের স্রোত যেরূপ কেহ বাধা দিতে পারে না, তদ্রূপ, কে সত্যের প্রকাশ আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারে? আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা নগরে প্রতিদিন পূর্ব্বাহ্নে সমবেত দৈনিক ব্রহ্মোপাসনার প্রবর্ত্তনা করেন। তাঁহার সহিত ক্রমশঃ একটী দুইটী করিয়া এমন কয়েকটী বিশ্বাসী ব্যাকুল চিত্ত ব্যক্তি আসিয়া মিলিত হন যে তদ্দ্বারা একটী ক্ষুদ্র ভক্তদলের উৎপত্তি হইল।

আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র এই দলের সেবকরূপে প্রতিদিন ব্যবহৃত হইতে থাকেন। এই দলের সেবাতে, তাঁহাকে, ৫০ বৎসরেরও অধিককাল, ভগবান্ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রতি দিনের আরাধনা প্রার্থনা এমন জীবন্ত ভাবে এবং নূতন ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, যে, যে কেহ তাহা একবার শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই তদ্দ্বারা আকৃষ্ট না হইয়া পারেন নাই। উচ্চ শ্রেণীর জ্ঞানী হইতে নিরক্ষর সামান্য লোক পর্য্যন্ত এই ব্রহ্মোপাসনার জীবন্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়াছেন। এই দৈনিক সমবেত ব্রহ্মোপাসনা একটী নূতন ব্যাপার। মুসলমানগণ শুক্রবারে সমবেত ভাবে নমাজ করিয়া থাকেন, খৃষ্টবাদিগণও রবিবারে এবং য়িহুদিগণ শনিবারে সমবেত ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন। এই সকল ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের উপাসনা প্রণালী দর্শনে আমাদের ধর্ম্ম পিতামহ রাজা রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া সাপ্তাহিক সম্মিলিত ব্রহ্মোপাসনার

ব্যবস্থা করেন। হিন্দুজাতির মধ্যে সমবেত ঈশ্বরোপাসনা প্রথম রামমোহনই প্রতিষ্ঠিত করেন। আর্য্য যোগি-ঋষিগণ সকলেই স্বতন্ত্র ভাবে একা একা ইষ্ট দেবতার সাধন ভজন করিয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে সববেত নাম-সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। এদেশে, একা একা যে সাধন ভজন করিতে হয়, তাহাই সকলে জানে, এবং তাহার সম্মান সকলে করিয়া থাকে। সুতরাং সমবেত ঈশ্বরোপনার সার্থকতা এদেশে কেহ পূর্ব্বে পরিগ্রহ করেন নাই। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন এদেশে এই দৈনিক সমবেত ব্রহ্মোপাসনার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার অনুসরণকারী বঙ্গচন্দ্রও এই পতিত পূর্ব্ববঙ্গের কল্যাণের জন্য ইহা ঢাকাতে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহা হইতে যে কি অভূতপূর্ব্ব মধুময় ফল এ দেশে প্রসবিত হইয়াছে, যথাসাধ্য তাহার একটু আভাস দিতে আমরা যত্ন করিতেছি। য়িহুদি এবং মুসলমান প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব বোধ অত্যন্ত প্রবল এবং বিধি পালন দ্বারা তাঁহার সেবা করিলে যে মানবজীবন স্বার্থক হয় এই ভাবই তাঁহাদের মধ্যে দেখা যায়। ব্রহ্মস্বরূপের সহিত সজ্ঞানে যোগযুক্ত হওয়ার ভাব আর্য্য ঋষিদিগের মধ্যেই বিশেষরূপে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। নববিধান-ধর্ম্মের বিশেষ শিক্ষা এই যে, যিনি এ ধর্ম্ম জীবনে সাধন করিবেন, তিনি যেমন এক দিকে ব্রহ্মের সহিত যোগযুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত স্বরূপৈক্য লাভ করিবেন, অপরদিকে তাঁহার বাণী শ্রবণ পূর্ব্বক জীবনে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সম্পাদন করিয়া ধন্য হইবেন। ব্রহ্মোপাসনা সম্বন্ধে এই জন্যই বলা হইয়াছে

'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।'
ইহাতে মহর্ষি ঈশার কথারও পূর্ণতা হইয়াছে। তিনি বলিলেন "তোমরা স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও"। ব্রহ্মস্বরূপের সহিত যোগের একতাই পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইবার একমাত্র পন্থা। ব্রহ্মস্বরূপ জীবে প্রকাশিত না হইলে কিরূপে সে তাহা অবগত হইবে? ইহা অসীম রহস্য যে অনন্ত ব্রহ্ম, অনন্ত থাকিয়া সীমাবিশিষ্ট ধূলি সদৃশ মনুষ্য সন্তানে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের মহিমা কঠোপনিষদে এইরূপ বিবৃত রহিয়াছে—

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্॥ কঠ।২।২৩।

অনেক উত্তম বচন দ্বারা বা মেধা দ্বারা অথবা বহু শ্রবণ দ্বারা এই পরমাত্মাকে লাভ করা যায় না। এই পরমাত্মা যে সাধক-কে মনোনীত করেন, সেই তাঁহাকে লাভ করে। পরমাত্মা এরূপ সাধকের সন্নিধানে আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন। ইহাই অর্থ।

পরমেশ্বর যেমন পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, জল, বায়ু প্রভৃতি বিভিন্ন উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তদ্রূপ মানব জাতির প্রত্যেক মনুষ্য সন্তানকেও তিনি বিভিন্ন অভিপ্রায় সম্পন্ন করিবার জন্য এই ধরাতলে প্রেরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং

তাঁহার স্বরূপ প্রকাশের জন্য যে তিনি বিভিন্ন ব্যক্তিদিগকে পৃথিবীতে মনোনীত করিয়া আনেন তাহা কেহ স্বীকার না করিয়া পারেন না। যাঁহাদিগকে পরমেশ্বর মানবমণ্ডলীতে আপনার স্বরূপ প্রকাশের জন্য যুগে যুগে দেশে দেশে মনোনীত করিয়া আনিয়াছেন তাঁহাদিগকে মহাজন, অবতার বা মধ্যবর্ত্তী বলিয়া লোকে সম্মান দান করিয়াছে ও করিতেছে। কিন্তু নববিধানের ব্যাপার একটী নূতন। গুরুবাদ, মধ্যবর্ত্তীবাদ, কিম্বা অবতার বাদের স্থান ইহাতে নাই। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র যদিও আপনাকে পাপীর সর্দ্দার বলিয়া দুঃখীতাপী জীবের আশার জন্য ভগবান্ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন, অতএব তিনি "আশার চন্দ্র", এই তত্ত্ব ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাঁহাতে সকল মহাজনের বিশেষত্ব ঘনীভূত আকারে প্রকাশ পাওয়াতে, তাঁহারও একটা বিশেষত্ব দাড়াইয়া গিয়াছে এবং সময়ে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছিন্ন-রূপে তাহা দাড়াইয়া যাইবে তাহার সম্ভাবনাও আছে। তিনি আপনাকে মহর্ষি ঈশার পাদুকাবন্ধন-উন্মোচনেরও-অনুপযুক্ত বলিলেন না, কেন না তাহা হইলে আপনাকে যোহনের সমান করা হয়। তিনি বলিলেন "আমি জুডাস্ এস্কেরিয়াট্"—যে ঈশাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। অথচ তাঁহাতে যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ হইয়াছে, একথাও তিনি মুক্ত-কণ্ঠেই ঘোষণা করিয়াগিয়াছেন। কেশবচন্দ্রে মহাজনদিগের ভাব থাকাতে অনেকে তাঁহাকে বুঝিতে অক্ষম, এবং ভবিষ্যতে যে এরূপ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে তাহারও সন্দেহ নাই।

কেশবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিয়াছেন এখনও পঞ্চাশ বৎসর হয় নাই। ইহার মধ্যেই তিনি, যে নববিবান, 'পবিত্রাত্মার বিধান' ঘোষণা করিলেন, এ তত্ত্ব পশ্চাতে পড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু পরমেশ্বর, যেরূপে এবং যে ভাবে এই সংসারে এক একটী বিধানে আপনার মহিমা মানব মণ্ডলীতে বিস্তার করিবেন, তাহার প্রণালী তিনি স্বয়ং ভাল জানেন। ভাল জানেন বলিয়াই, তিনি কলিকাতার বড় দলের পশ্চাতে এমন একটী ক্ষুদ্র নগণ্য দল, এবং এমন একজনকে সেই দলের অগ্রণী বা জ্যেষ্ঠরূপে মনোনীত করিয়া আনিলেন, যাঁহাদের দেখিলে আর মানুষকে ভ্রমে পড়িতে হইবে না। মহর্ষি ঈশার প্রভাব, তদীয় জীবনের আরম্ভেই চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎপ্রদত্ত উপদেশ—""সারমন অন্ দি মাউণ্ট"""—তাঁহার মহত্ত্ব অতি পরিষ্কাররূপেই য়িহুদি দিগের নিকট প্রকাশিত করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও য়িহুদিগণ বলিতে ছাড়ে নাই—"নেজারথ্ নগর হইতে আবার ভাল কি আসিবার সম্ভাবনা হইতে পারে?" মহর্ষি ঈশার সম্বন্ধেই যখন লোকে এরূপ কথা বলিতে সাহসী হইয়াছে, তখন ঢাকার ক্ষুদ্র নগণ্য দলে, এবং তাহার ক্ষুদ্র নেতার জীবন বৃক্ষ হইতে, যে সুফল প্রসবিত হইয়াছে, তাহা যে নিতান্তই বিশ্বাস-যোগ্য নয়, তাহা সকলে ভাবিতে পারে। কিন্তু পরমেশ্বর অঘটন সংঘটন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যাহা কেহ দেখে নাই, বা শুনে নাই, এমন সকল কার্য্য করিয়া ঈশ্বর আপনার মহিমা ও গৌরব জগতে বিস্তার করিয়া থাকেন। সুতরাং যে ক্ষুদ্র দল ও যে নেতার কথা আমরা

উল্লেখ করিতেছি, ভগবান্ আপনার গৌরবের জন্যই তাহাতে আত্ম-প্রকাশ করিয়া স্বীয় মহিমা বিস্তার করিয়াছেন। পরমেশ্বর যে স্বীয় মহিমা ও গৌরব বিস্তারের জন্যই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন, অথচ অল্পবিশ্বাসী মানব তাহা বুঝিতে পারে না, তাহার প্রমাণ মহর্ষি ঈশার জীবনের একটী ঘটনা, ও তদুপলক্ষে তাঁহার মুখ-বিনিস্থত বাক্য প্রমাণ দান করিবে। ব্যাপারটী এইভাবে লিপিবদ্ধ হইতে পারে। এক সময় কয়েকটী ইহুদি ঈশাকে পরীক্ষা করিবার জন্য, একজন জন্মান্ধকে লইয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হয় এবং প্রশ্ন করে যে—'এই লোকটী জন্মান্ধ কেন হইল? ইহার পিতামাতার বা পূর্ব্বপুরুষের এমন কোন দোষ নাই যেজন্য এ লোক জন্মান্ধ হইয়াছে বলা যায়; তবে তুমি এসম্বন্ধে কি বল?' মহর্ষি ঈশা ইহা শুনিয়া, তাঁহার চির অবলম্বিত প্রণালী অনুসারে কিছু কাল অবনত মস্তকে অধোমুখী হইয়া রহিলেন, এবং হস্তদ্বারা মৃত্তিকাতে কিছু কাল রেখা টানিয়া যথাসময়ে উন্নত মস্তকে বলিলেন, "এই লোক যে জন্মান্ধ হইয়াছে, তাহা ঈশ্বরের গৌরবের জন্য।" এ কথায় উপস্থিত লোকেরা আর কোন কথা বলিতে সাহস না করিয়া চলিয়া গেল। বস্তুতঃ এই বিশ্ব মাঝে ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল ঘটনাই যে পরমেশ্বর স্বীয় গৌরব ও মহিমা বিস্তার জন্য করিয়া থাকেন, তাহা সকলে জানে না। প্রকাণ্ড সূর্য্য আর ক্ষুদ্র ধূলিকণা, বিশালবক্ষঃ সাগর আর অতি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দু, সকলই যে জীবন্ত পরমেশ্বরের মহিমা ও গৌরবের পরিচয় দিতেছে, তাহা না হয় একজন স্বীকার করিল। কিন্তু অনন্ত পরমেশ্বর, যিনি

চিরকাল সাধু মহাজনদিগকে লইয়া আপনার লীলা প্রকাশ করিয়াছেন, পুণ্যাত্মাদিগের নিকট আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি অতি নগণ্য সামান্য, নানারূপে পাপযুক্ত মলিনদিগের মধ্যে আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন, একথা স্বীকার করা অসম্ভব ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু এ যুগে সেই অসম্ভব, সম্ভব হইয়াছে। আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ইহাই লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল হইয়াছি। ব্রহ্ম যাঁহাকে মনোনীত করেন, তাহার নিকট তিনি আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন, কঠোপনিষদের এই সত্য তত্ত্ব মানিলে আর আমাদের কথার প্রতিবাদ করিতে কেহ সাহসী হইতে পারিবেন না। ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

নবজীবন লাভ।

মনুষ্য সন্তান যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে ক্রন্দন করিয়া আপনার জীবন্ত জাগ্রতাবস্থা প্রকাশ করে। অপরের সাহায্য না পাইলে, মাতৃবক্ষে মাথা রাখিতে না পারিলে, মাতৃস্তন্য পান না করিলে এবং মাতৃ হস্তের স্পর্শানুভূতি অনুভব না করিলে, সেই সদ্যপ্রসূত শিশু কিছুতে আরাম বোধ করে না। জীবন্ত ঈশ্বরে-নবজীবন-প্রাপ্ত উপাসকের ও এই অবস্থা ঘটে। নির্ব্বাণ প্রাপ্ত শাক্যমুনি নবজীবন লাভ করিয়া "বুদ্ধ" অর্থাৎ নিত্য জাগরিত এই নাম গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপ-চন্দ্র বিশ্বম্ভর (নিমাই) অনুপ্রাণিত হইয়া স্বীয় দীক্ষাগুরু কেশবভারতীকে বলিলেন "আমাকে আপনি 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' এই নাম প্রদান করুন।" নেজারথের যিসু নবভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া অগ্রে যোহনের নিকট জলাভিষেক গ্রহণ করিলেন, তৎপর বিবেক ও বৈরাগ্য-বলে পাপ-সয়তানের উপর জয়লাভ করিয়া স্বীয় জীবনের কার্য্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথমতঃ নিরক্ষর অসভ্য মৎস্যব্যবসায়ী ধীবর সন্তান-দিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন "তোমরা মৎস্যধরা ত্যাগ করিয়া এস, তোমাদিগকে মানুষ ধরিতে হইবে।" ধীবরগণ অমনি তৎক্ষণাৎ মৎস্য ধরা ত্যাগ করিয়া ঈশার সঙ্গী হইল, এবং তাঁহার জীবনের কার্য্যের সহায় হইল। এরূপ শুনিয়াছি যে ব্রহ্মানন্দ

কেশবচন্দ্র একদিন প্রভাতকালে ডাকিয়া বলিলেন “অমৃত, জাগ, উঠ, এস”। কলিকাতার হাটখোলার বকাইটা ছেলে যুবক অমৃত তাঁহার আহ্বান-ধ্বনি শুনিয়া প্রাভাতিক সুনিদ্রা হইতে জাগিলেন, উঠিলেন এবং চিরদিনের তরে কেশবচন্দ্রের অনুগামী হইলেন। বস্তুতঃ ব্রহ্মাণ্ডপতির বংশীধ্বনি যাঁহার কর্ণে প্রবেশ করে, তিনি যেমন নিজে জাগ্রত হন, তদ্রূপ, জাগ্রত হইয়া অন্যান্যকেও জাগাইবার জন্য একান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি স্বর্গরাজ্যের যে অলৌকিক শোভা দর্শন করেন, সেই শোভা ও অপরে দেখিয়া সুখী হউক, এজন্য তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। কথিত আছে একদা পূর্ণিমা নিশীথে তপস্বিনী রাবেয়া, পরমাত্মাতে স্বীয় আত্মার সমাধান করিয়া পরম সুন্দর প্রাণেশ্বরের স্বরূপ-মাধুর্য্যে ডুবিয়া শোভা দর্শন করিতেছেন; ইতিমধ্যে তাঁহার সেবিকা বাহিরে আসিয়া, সুনীল আকাশে পূর্ণ চন্দ্রের উদয়ে প্রকৃতির যে পরম শোভা হইয়াছে, তাহা দর্শনে মোহিত হইয়াছেন। তখন সেবিকা সেই শোভা দর্শন করিবার জন্য রাবেয়াকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন তপস্বিনী রাবেয়া সেই সেবিকাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—‘তুমি ভিতরে আসিয়া চিদাকাশে পূর্ণ প্রেম চন্দ্রের প্রকাশে যে শোভা হইয়াছে তাহা দেখ।’ শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র যখন ব্রহ্মে সঞ্জীবিত হইয়া নবজীবন লাভ করিলেন, তখন তাঁহার প্রাণে একটী নবীন উচ্চ আকাঙ্ক্ষা আসিয়া উপস্থিত হইল।

সেই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এই—যদ্দ্বারা প্রণোদিত হইয়া ঈশা ধীবর তনয়দিগকে ‘এস তোমরা মানুষ ধরিবে’ বলিয়াছিলেন, এবং যে

আকাঙ্ক্ষায় ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সঙ্গত সভা স্থাপন করিয়াছিলেন; সে আকাঙ্ক্ষার মূলে জীবন্ত ঈশ্বরের ইচ্ছা গূঢ়রূপে নিহিত ছিল। বঙ্গচন্দ্র প্রার্থনা করিলেন—এ সময় এমন কয়েকটী লোক চাই, যাহারা সেই ভক্ত-চিত্তহারী ভগবানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী, স্ত্রী, পুত্র, ধন, মান, বিত্ত প্রভৃতি তাঁহারই পদে সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার গুণের কথা সকলকে বলিবে এবং তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য বইবে। মহর্ষি ঈশা বলিলেন "তোমরা অগ্রে ঈশ্বরের রাজ্য ও তাঁহার ধর্ম্ম অন্বেষণ কর, আর আর যাহা কিছু প্রয়োজন, তোমাদিগকে প্রদত্ত হইবে।" বঙ্গচন্দ্রও ভগবদ্গীতোক্ত

"সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"

সমুদায় ধর্ম্ম ছাড়িয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও—এই মহাবাক্যের অনুসরণে, অল্প কয়েকটী বন্ধু লইয়া নিত্য উপাসনা-ব্রতে ব্রতী হইলেন, এবং দীন অকিঞ্চন হইয়া সরল অন্তরে পরব্রহ্মের শরণাপন্ন হইলেনও তাঁহার প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রসন্নতা নিম্নলিখিত সঙ্গীতে অতি সুন্দররূপে প্রকাশিত হইয়াছে।

কীর্ত্তন। তাল খেমটা।

(দর্শন)

চেয়ে দেখ্‌রে জীব শ্রীহরি বর্ত্তমান,
সকল গুণের নিধান।
সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, নহে অনুমান,
এ রূপের গুণে, অন্ধজনে, পায় চক্ষুদান।
(এ নহে কবি কল্পনা রে)।

যেজন সরল বিশ্বাসভরে,
এই যে হরি" স্বীকার করে,
(অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করি হে)
তারে যথা তথা দেখা দেন, স্বয়ং ভগবান্।

(ব্যাকুলতা)।

(আমি) চাই হে, হরি দরশন চাই।
আমার হরি বিনে, কোথাও আর কিছু নাই।
আমি যা দেখি হে চক্ষে, আঁধার আমার পক্ষে,
যদি হে সমক্ষে, হরিকে না পাই।
আমার হরি অন্নজলে, অনিল অনলে,
(তরু) লতা, ফুল, ফলে,
আমারি গোসাঞী।
আমার হরি ই এক জীবন,
ধন, মান, রূপ, যৌবন,
হরি নিশ্বাস পবনে, দর্শনে শ্রবণে,
তাই হে বেঁচে আছি, দেখ্‌তে শুন্‌তে পাই।

এরূপ ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত য়িহুদি ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, যথা :—

"মৃগ যেমন জলাশয়ের জন্য তৃষ্ণার্ত্ত হয়, হে ঈশ্বর, আমার আত্মা, সেইরূপ তোমার জন্য তৃষিত হইতেছে।" দাউদের গীত। ৪২।১।

"আমার আত্মা ঈশ্বরের জন্য, ঐ জীবন্ত ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল হইতেছে, কবে আমি ঈশ্বরের সম্মুখে উপস্থিত হইব।" ঐ। ৪২।২

শ্রীমদ্ভাগবতেও আছে যথা ঃ—

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্ত্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্॥ ৫।১১।২৬।

অনুবাদ। যেরূপ অজাতপক্ষ পক্ষীশাবক মাতার আগমন প্রতীক্ষা করে, যেরূপ গোবৎস ক্ষুধার্ত্ত হইয়া মাতৃস্তন্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, এবং যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্তা প্রেয়সী দূরদেশগত প্রিয়তমের জন্য অত্যন্ত কাতর হয়, তদ্রূপ, হে অরবিন্দাক্ষ (ভগবন্) আমার আত্মা তোমাকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

এইরূপ ব্যাকুল আত্মার নিকট যে ঈশ্বর আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করেন, পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সমূহ তাহাই প্রমাণ করিবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

জীবন্ত ঈশ্বর।

ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ তিন স্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে

১। প্রথমতঃ বহির্জগতে—সৃষ্টি মধ্যে।

২। দ্বিতীয়তঃ মহাত্মাদিগের জীবনে।

৩। তৃতীয়তঃ প্রতি মানবের স্বীয় অন্তরে।

এজন্য প্রেমদাস গাহিলেন—

দেশ বাহার—কাওয়ালি।

দাও মা আনন্দময়ী দরশন।
তব প্রেমানন, ভকত রঞ্জন,
যার প্রভাবে সঞ্চারে জীবন॥
নব নব রূপ ধরি, প্রাণ মন লও হরি,
কখন একাকী, কভু
সাধুগণে সঙ্গে করি, বিচিত্র রূপ হেরি,
জুড়াইব তৃষিত নয়ন।
অনন্ত গুণ ধারিণী মা, অনন্ত রূপিণী,
নিরখি তোমারে (১) বিশ্ব চরাচরে,
(২) সাধুর অন্তরে (৩) হৃদয় ভিতরে,
আনন্দে হইব মগন।

(১) সৃষ্টিতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ।

সৃষ্টির মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ দর্শন এবং সৃষ্টিতে ব্রহ্মের অলৌকিক কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহাকে স্বীকার করা, এ দুই, আসমান জমিনের মত, দুই বিভিন্ন অবস্থা। এই জন্যই কঠোপনিষদ্ বলিতেছেন ঃ—"সূর্য্য তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, চন্দ্র তারকাও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, এই সকল বিদ্যুৎও তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ; তবে এই অগ্নি তাঁহাকে কিরূপে প্রকাশ করিবে? সমুদয় জগৎ সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে ; এই সমুদয় তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে।" এই যে "সেই দীপ্যমান পরমেশ্বরেরই প্রকাশ দ্বারা অনুপ্রকাশিত হইয়া দীপ্তি পাইতেছে, এ সকল তাঁহারই প্রকাশে প্রকাশিত হইতেছে" ইহা অতি গুরুতর কথা, এ কথার উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। সূর্য্যের প্রকাশে বাহ্য জগৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। সূর্য্য প্রকাশিত না হইলে জগৎ অন্ধকারে বিলীন হয়। সূর্য্য আপানাকেও দেখায়, জগৎও দেখায়। ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ, অগ্নি প্রভৃতি সমুদয় সৃষ্টি তাঁহাতে বিলীন হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে।

আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র যখন এই বাহ্য জগতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ দেখিলেন, তখনই তাঁহার প্রাণ-মন-আত্মা, নবভাবে উদ্বুদ্ধ

হইল। তাঁহার সেই উদ্বুদ্ধ ভাব, বক্তৃতাতে প্রকাশের জন্য, তৎকালে যে রূপে সঙ্গীতাকারে শ্রদ্ধেয় ভাই দুর্গানাথকর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, এস্থলে অগ্রে তাহা প্রদত্ত হইতেছে।

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই যে বর্ত্তমান।
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন, তৃপ্ত হয় কি মন করে অনুমান।
এই যে সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়, জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই তো পাপীর বন্ধু, দীন-দয়াময়, পূর্ণ কর্ম্মঠ পুরুষ প্রধান।
এই তো চিন্তামণি চিরন্তন ধন, এই তো দয়াল হরি হৃদয় রতন,
এই তো প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর, কোথা যাব আর করিতে সন্ধান।
এই তো নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন, মধুর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা, শান্তি-রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে, কালেতে এক্ষণ, প্রাণ-সখা আমার, প্রিয় দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন, হারালে হৃদয় হয় যে শ্মশান।

ইহা বলা নিষ্প্রয়োজন যে, যে হৃদয় হইতে উল্লিখিত সঙ্গীতের ভাব উদ্‌ভাসিত হইয়াছিল এবং যে কণ্ঠে উহা গীত হইয়াছিল, তাহাও যে, তৎকালে, সেই পবিত্র-আত্মা দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল, যে পবিত্র-আত্মা তৎকালে বঙ্গচন্দ্রকে 'জীবন্ত ঈশ্বর' বিষয়ে বক্তৃতা করিবার জন্য একান্ত উদ্যমশীল ও ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভক্ত রামপ্রসাদ বলিয়াছেন "আমার মায়ের মুখ, দেতোর হাসী।" দন্তিল মনুষ্যের হাসিতে যেরূপ দন্ত-পংক্তি বাহির হইয়া পড়ে তদ্রূপ মার শ্রীমুখ সর্ব্বত্র প্রকাশিত। সুতরাং জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশে সর্ব্বত্র তাঁহাকেই দেখিতে হয়।

"জীবন্ত ঈশ্বর" ইহা অতি প্রাচীন বাক্য। পুরাতন বাইবেলে, মুসার ধর্ম্ম বিধানের যুগ হইতে, (Living God) 'জীবন্ত ঈশ্বর', এইটী পাওয়া যায়। জীবন্ত ঈশ্বর বলিতে যিনি নিত্য বাঙ্ময় এবং একান্ত উদ্যমশীল কর্ম্মঠ, তাঁহাকে বুঝায়। জীবন্ত ঈশ্বর বলিলে, আর্য্য ঋষিদিগের নিকট প্রকাশিত নির্লিপ্ত ঈশ্বরকে বুঝায় না। উল্লিখিত সঙ্গীতে জীবন্ত ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তাহাই প্রমাণ। হজরত মুসা, জীবন্ত ঈশ্বরের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়া ইজ্‌রেল বংশীয়দিগকে লইয়া মিসর দেশ হইতে জর্ডন নদীর তীর পর্য্যন্ত আসিয়া উপস্থিত হন। ইহাতে তাঁহার ৪০ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরের নিষেধ অনুসারে জর্ডন নদী পার হইয়া, কেনান রাজ্যে প্রবেশ করেন নাই; তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী কালে সম্পন্ন হইয়াছিল। মুসার পরবর্ত্তী কালে, ইজ্‌রেল বংশীয়দিগকে অনুশাসন দিবার জন্য বহু সংখ্যক ধর্ম্মনেতা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের সকলেই জীবন্ত ঈশ্বরের বাণীতে অনুপ্রাণিত হইতেন। ইহা পুরাতন বাইবেলে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। এই জীবন্ত ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের অনুসরণে নববিধানের নব তপস্যাচরণে নিযুক্ত হন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ এক সময় প্রকাশ্য পত্রিকায় (The New Dispensation) লিখিয়াছিলেন, "To fall in the hands of the Living God is a dangerous thing." অর্থাৎ জীবন্ত ঈশ্বরের হস্তে পতিত হওয়া বড় বিপজ্জনক অবস্থা। কেননা, আমরা অদ্য যেখানে, যে অবস্থায় আছি, তাহাই জানিতেছি,

কল্য যে কোথায় এবং কি অবস্থায় থাকিব, তাহা জানি না।" আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে, জীবন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়া পৃথিবী অল্লাধিক পরিমাণে স্বীকার করিয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও করিবে। উপাচার্য্য বঙ্গচন্দ্রে জীবন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বীকার করিতে, পৃথিবীর আরও অধিক কাল লাগিবে। প্রাতঃকালীন সূর্য্যের আলো যেরূপ হিমালয়ের উচ্চ শৃঙ্গেই দৃষ্ট হয়, অনেক দূর সূর্য্য আকাশে উদিত হইলে পরে, তবে তাহার কিরণমালা হিমালয়ের পাদদেশে এবং পৃথিবীতে বিকীর্ণ হয়। তদ্রূপ আচার্য্য ব্রহ্মানন্দে জীবন্ত ঈশ্বরের কার্য্য, পৃথিবীর দূরবর্ত্তী দেশে স্বীকৃত হইলেও, উপাচার্য্য বঙ্গচন্দ্রে তাঁহার ক্রিয়া স্বীকার করিতে নিকটস্থ লোকদিগেরও আগ্রহ হইবে না। কিন্তু পৃথিবী যত দিনেই তাহা স্বীকার করুক, আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বঙ্গচন্দ্রকে স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহাতেই পৃথিবী তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছে, বলা যায়। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, 'যে জীবন্ত ঈশ্বর কলিকাতাতে কার্য্য করিতেছেন, সেই ঈশ্বরই ঢাকাতেও কার্য্য করিতেছেন।'

প্রধান আচার্য্য ধর্ম্মপিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৮৬৯ সালে বঙ্গচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "ঢাকার বঙ্গচন্দ্র, ঢাকা থাক, ঢাকা থাক।" মহর্ষির এই আশীর্ব্বাদ ব্যর্থ হইবার নহে। বঙ্গচন্দ্র যে ঢাকা থাকিবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বঙ্গচন্দ্রকে স্বীকার করাতে, পৃথিবীও তাঁহাকে স্বীকার করিয়াছে, একথা আরও পরিষ্কাররূপে বুঝিবার জন্য, এস্থলে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দকৃত একটী প্রার্থনা উদ্ধার করা যাইতেছে; তাহা হইতে

বুঝিতে পারা যাইবে, বঙ্গচন্দ্র সম্বন্ধে কেশবচন্দ্রের স্বীকৃতি কত সত্য, কত গভীর, এবং কত প্রেম ও ভালবাসা পূর্ণ।

দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম ভাগ। (৩৬ পৃষ্ঠা)

২৮শে নবেম্বর ১৮৮২।

আশার নিদর্শন।

হে পিতা, হে সুন্দর ঈশ্বর, কে আমাদের? কি লক্ষণ থাকিলে মানুষ আমাদের হয়? যে ভালবাসাতে সমস্ত পৃথিবীকে আত্মীয় করা যায়, আপনার করা যায়, যে ভালবাসাতে সমুদয় ধর্ম্ম এক করা যায়, সমুদয় জাতির মিলন করা যায়, সকলকে এক করা যায়, সেই ভালবাসা যাদের তারাই আমাদের। প্রেমিক যিনি, শুদ্ধ চরিত্র যিনি তিনি আমাদের। হে হৃদয়েশ্বর, এই প্রধান লক্ষণ তোমার নববিধানে,—সকলকে এক করা, প্রেমেতে সকলকে এক করা। এই ভাবের ভাবুক যাঁরা তাঁরা আমাদের। তোমার এইভাব একটু একটু দেখা যাইতেছে পূর্ব্বাঞ্চলে,—যেখানকার মনোহর সংবাদ এই কষ্টের সময় মনকে সুখী করিতেছে। তোমার চরণ ধরে বলি, তোমার বিশেষ আশীর্ব্বাদ তাঁদের মস্তকের উপর অবতরণ করুক। ইহাঁরা ক্ষুদ্র অলক্ষিত মান্যভ্রষ্ট অত্যন্ত নীচাবস্থায় কাল কাটাইতেছেন। কিন্তু প্রেমিকের চিত্র তাঁদের জীবনে দেখা যাইতেছে। এখানকার যে সকল বিষয় লইয়া আমরা আক্ষেপ করি সেই ক্ষুদ্র দলের মধ্যে তা নাই কেন? জন কতক লোক একত্র হইয়া পরস্পরের

প্রেমে আবদ্ধ হইয়া জীবন কাটাইতেছেন। তাঁদেরও পাপ আছে বটে, কিন্তু যে যে বিষয়ের জন্য আমরা আক্ষেপ করি, তা তাঁদের মধ্যে নাই। শ্রীহরি, দীনাত্মাদের দ্বারা তুমি অনেক কাজ করাইয়া লইলে। দুঃখীকে তুমি বুকে করিয়া রাখ। ঐ ক্ষুদ্র ভাইয়ের দলকে তুমি তোমার নববিধানে বিশেষ আশ্রয় দিয়া আমাদের শিক্ষাগুরু করিয়া রাখ। উহারা আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে। তুমি বলিতেছ "দেখ রে কলিকাতার প্রচারক-গণ, এদের বিনয়, নম্রতা, শান্তি এত বাড়িতেছে কেন? তোদের এত কম্‌চে কেন? এরাই বা এদের দলপতির কথা এত শুনে কেন? তোরাই বা শুনিস্ না কেন? এদেরই বা পরস্পরের প্রতি এত প্রেম কেন? তোদেরই বা তা নাই কেন? ঠাকুর আমরা নেবে যাই, ওরা উপরে উঠুক। যেখানে সরলতা, নম্রতা, সেখানেই পুরস্কার। এর ভিতর যদি এক একটী প্রচারক এক একটী স্থানে আরো প্রচারক প্রস্তুত করিয়া দলপতির প্রতি কিরূপ করিতে হয়, দলপতি কিরূপ হইতে হয় দেখাইতেন, আর প্রেমরাজ্য স্থাপন করিতেন, কত ভাল হইত। আমার মনে কত সুখ হইত। ইহাও আমার পক্ষে সুখের সংবাদ; এক জায়গায়ও ত আমার পিতার কীর্ত্তি স্থাপিত হইল। মা, তাদের কাছে চিরকাল থেকো। তারা বড় গরীব। বড় মধুর ভাব তাদের। হৃদয়ের সাধ খানিক তারা মিটাইতেছে। প্রেমের ধর্ম্ম কি, তাহা তাঁরা দেখালেন। নববিধানের প্রধান লক্ষণ ওখানে দেখা দিচ্চে। এখনো বলি না যে পূর্ণ পরিবার

হয়েছে, কিন্তু আমাদের চেয়ে ত ভাল। দলপতির প্রতি কিরূপ ভক্তি, ভালবাসা দেখাতে হয় তাঁরা আমাদের শিক্ষা দিন্; কেমন করে গরীব হতে হয়, কেমন করে পরস্পরকে ভালবাসিতে হয় শিক্ষা দিন। একটী প্রেমের দুর্গ হইল, একটা দীনাত্মাদের আশ্রয় স্থান হইল, এ আশার কথা। বড় সুখের সংবাদ। পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে পরিত্রাণের সংবাদ আসিবে। তাই হউক। আমাদিগকে শিক্ষা দিবার ভার ওদের উপর? তবে তাই হউক। যাতে আমরা ভাল হই তাই হউক। (মো)

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শ্রীমদাচার্য্য ব্রহ্মানন্দের এই স্বীকার উক্তিকে আমরা পৃথিবীর স্বীকারোক্তি বলিতেছি। এ সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তি এস্থলে উল্লেখ করিতেছি। কথিত আছে, কোন সময়ে কার্ত্তিকেয় ও গণেশ, দুই জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তর্ক উপস্থিত হওয়াতে, উভয়ে তাহা মীমাংসার জন্য, আদ্যাশক্তি ভগবতীর নিকট উপস্থিত হইলেন। ভগবতী তাঁহাদের মুখে তাবৎ শ্রবণ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যিনি অগ্রে ব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ করিয়া আমার নিকট উপস্থিত হইতে পারিবেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ।" দেব-সেনাপতি কার্ত্তিকেয়, তাহা শ্রবণ করিয়া স্বীয় বাহন ময়ূরের পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড-প্রদক্ষিণ করিতে বাহির হইলেন। লম্বোদর গণেশ কিঞ্চিৎকাল ধ্যানস্থ থাকিয়া বুঝিতে পারিলেন, আদ্যাশক্তি ভগবতীর মধ্যেই ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে; তখন তিনি তাঁহাকেই প্রদক্ষিণ করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। কার্ত্তিকেয়

ফিরিয়া আসিরা জানিলেন, গণেশ ব্রহ্মাণ্ডোদরী জগজ্জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়া তাঁহার উপর জয়লাভ করিয়াছেন এবং শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন।

বস্তুতঃ বঙ্গচন্দ্রে, জীবন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়া স্বীকার করিয়া আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ, ধর্ম্ম-জগতের ইতিহাসে, এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন। শুধু তিনি মানব জাতির প্রতিনিধি স্বরূপ ইহা স্বীকার করিয়াছেন তাহা নহে। তাঁহাতে প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় সাধুসজ্জন ও মহাজনদিগের মিলন হওয়াতে, কেশবচন্দ্র, সর্ব্বকালের সাধুভক্তগণের আধার ও প্রতিনিধিরূপে, বঙ্গচন্দ্রকে স্বীকার করিয়াছেন, ইহা নিঃসংশয় চিত্তে বলা যাইতে পারে। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র সৃষ্টি মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ কত উজ্জ্বল-রূপে দর্শন করিয়া ছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত সঙ্গীতে প্রকাশ পাইবে।—

খাম্বাজ—একতালা।

কত কাল ভবে ঘুমাইয়ে রবে, হওরে জীব, সচেতন।
পবিত্রাত্মা হরি, নব বেশ ধরি, করেছেন আগমন।
দয়াময় হরির অপার করুণা, ঘুচাইতে পাপীর পাপের যাতনা,
করে জগৎ পূর্ণ, হলেন অবতীর্ণ, পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
পরম সুন্দর শ্রীহরি আমার, দেখিলে হয় প্রাণে প্রেমের সঞ্চার, পাপ তাপ শোক রহে না কো আর, পায় জীব নব জীবন।

(২) মহাত্মাদিগেতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ।

ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠার বিগত একশত বৎসর কাল মধ্যে আমরা ব্রাহ্মসমাজে তিনটী মহাত্মার আবির্ভাব এবং তিরোভাব দর্শন করি। সেই মহাত্মা ত্রিতয়—রাজা **রামমোহন** রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন। এই সকল মহাপুরুষদিগের মধ্যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ প্রদর্শন করা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য নহে, কারণ তাহা সর্ব্বজন বিদিত। শুধু, আমাদের বিষয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এখানে দিঙ্মাত্রে তাঁহাদিগেতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

রাজা রামমোহন রায়।

রামমোহন গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন এবং তাঁহার মধ্যে বৈদান্তিক ভাব অপেক্ষা বৈদিক ভাবই প্রবল ছিল বলিয়া মনে হয়। বৈদান্তিক ভাব অর্থাৎ ঈশ্বর মানব অন্তরে আছেন, ইহা একটু অনুভব না করিলে, কেহ তাঁহার প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া যোগ ভক্তিতে মত্ত হইতে পারে না। রামমোহনে বৈদিক ভাব, অর্থাৎ সৃষ্টি মধ্যে ঈশ্বর বিরাজিত, প্রবল থাকাতে, তাঁহার রচিত সঙ্গীতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। যথা—

ইমন কল্যাণ—আড়াঠেকা।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার আদি অন্ত নাই যার, সে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাকে।

"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তন্দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং, পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্, বিদামদেবং ভুবনেশমীড্যম্।"

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে।

মানুষের হৃদয় যখন প্রেম-ভক্তির ভাবে পূর্ণ হয়, তখনই তাহার হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গিয়া সেই ভাব সঙ্গীতাকারে প্রকাশিত হয়। সুতরাং আমরা উল্লিখিত সঙ্গীত হইতে রামমোহনে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে কতকটা ভাব পরিগ্রহ করিতে পারি। গায়ত্রী মন্ত্রের প্রথম পাদ "ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ"। ইহার অর্থ এই যে যিনি ভুলোক, ভুবর্লোক (১) এবং স্বর্গলোক তিনি সত্য। সুতরাং রামমোহন গাইলেন 'ভাব সেই একে, জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।' ব্রাহ্মসমাজে মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের সময় হইতে যে আরাধনার মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে, তাহার সহিত তুলনা করিয়া রামমোহনে ব্রহ্মপ্রকাশ এইরূপে লিপিবদ্ধ হইতে পারে, যথা ঃ—ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। জ্ঞানস্বরূপ হইতে ব্রহ্মের অন্যান্য স্বরূপ স্বতন্ত্র করা যায় না। সুতরাং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকেই আমরা জ্ঞাত হই, এই ভাবে রামমোহন ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন মনে হয়; এবং তাঁহাকে জ্ঞাত হইবার একমাত্র প্রণালী যে বিবেক ও বৈরাগ্যের

(১) ভুবর্লোক—পৃথিবী এবং সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থান।

অনুসরণ করা, তাহাও তিনি প্রদর্শন করিতে ভুলেন নাই। আচার্য্য শঙ্করকৃত "নিত্যানিত্য বিবেক", তিনি বাঙ্গলাতে অনুবাদ করেন। এই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে ঈশ্বর নিত্য এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাবৎ বস্তু অনিত্য, বিবেকে ইহা না জানিলে, মানুষ কিরূপে অনিত্য ছাড়িয়া নিত্যকে আশ্রয় করিতে পারে? এজন্য মানুষের প্রকৃতি গত নিত্য এবং অনিত্য জ্ঞান যাহাতে জাগিয়া উঠে তজ্জন্য তিনি যত্ন করিলেন। নিত্য বস্তু অতীন্দ্রিয় ঈশ্বর। আর অনিত্য বস্তু দেহ, গেহ, ধন, জন, বিত্ত ইত্যাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সকল। এ সকল যে অনিত্য তাহা সত্যভাবে মনে মনে আলোচনা করিলে তাবৎ অনিত্যের মধ্যে যিনি নিত্য, তাঁহার ভাব অন্তরে জাগ্রত হয়। এই জন্যই রামমোহনের সঙ্গীতে আমরা দেখিতে পাই,

"আমি হই আমি করি ত্যজ অভিমান। উচিত হয় এই করিতে আপনারে যত্ন জ্ঞান।" "কেমনে হবে পার, সংসার পারাবার, বিনা জ্ঞান তরণি বিবেক কর্ণধার।" "একদিন যদি হবে অবশ্য মরণ।" "এই দেহের এত অহঙ্কার।" ইত্যাদি।

এইরূপে বিবেক ও বৈরাগ্য যোগে মনুষ্য যত অনিত্যের মধ্যে নিত্যের আলোচনা অন্তরে অন্তরে করে, তত তাহার অন্তরে নিত্য জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। মহাভারত শান্তি পর্ব্বে আছে—

অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ দ্বয়ং দেহে প্রতিষ্ঠিতম্।

মৃত্যুরাপদ্যতে মোহাৎ সত্যেনাপদ্যতেঽমৃতম্॥ (শা ১৭৫ অ, ৩০ শ্লো)

অর্থাৎ মৃত্যু ও অমরত্ব এ দুইই মানব দেহে স্থিতি করিতেছে। মনুষ্য মোহপ্রযুক্ত মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, আর সত্যকে আশ্রয় করিলে অমরত্ব লাভ করে।

এই জন্য ভগবদ্গীতাতেও বলা হইল ঃ—

"ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিলে, আসক্তি জন্মে। আসক্তি হইতে বাসনা, বাসনা হইতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতি বিভ্রম, স্মৃতি বিভ্রমে বুদ্ধি নাশ, বুদ্ধি নাশে মনুষ্য বিনষ্ট হয়।"

অতীন্দ্রিয় নিত্য বস্তুকে ভুলিয়া থাকাই মোহ, ইহা মহাভারত বলিলেন। আর অতীন্দ্রিয় নিত্য বস্তুকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়ের বিষয় চিন্তা করিলে তাহাতে আসক্তি জন্মে, এই আসক্তি হইতে বাসনা, বাসনার ব্যাঘাতে ক্রোধ, ক্রোধ হইতে জীবের মোহ এবং ক্রমে এইরূপে মনুষ্য নষ্ট হয়, ভগবদ্গীতা তাহা বলিলেন। এই বিনাশ হইতে মানবের উদ্ধারের জন্য, রামমোহন দেখিলেন, ঈশ্বরকে স্মরণ করা মনুষ্যের পক্ষে একমাত্র উপায় এবং সেই জন্যই আমরা তাঁহার সঙ্গীতে পাই 'স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।' এ সম্বন্ধে বিষ্ণুপুরাণে আছে—

আয়াসঃ স্মরণে কোঽস্য স্মৃতো যচ্ছতি শোভনম্।
পাপক্ষয়শ্চ ভবতি স্মরতাং তমহর্নিশম্॥ বিষ্ণু পুঃ ১।১৭।৭৮।

অর্থ। তাঁহাকে স্মরণ করিতে আয়াস কি? স্মরণ করিলেই মঙ্গল লাভ হয়। যে ব্যক্তি দিবানিশি তাঁহাকে স্মরণ করে, তাহার সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া যায়।"

এক্ষণে এই নিত্য পরমেশ্বরের প্রকাশ কি ভাবে রামমোহন অনুভব করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে তাঁহার একটী সঙ্গীত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যথা—

ধ্রুবপদ।

স্মর পরমেশ্বরে মন আমার।
আর কি কর চিন্তা ভবে সেই মাত্র সার।

অন্তরা।

সঙ্গকরি তত্ত্বজ্ঞানী, আছে মাত্র এই জানি, বিশ্বময় তাঁরে নিত্যমানি, ত্যজ আশা অহঙ্কার।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল কারণ, বিভু বিশ্ব নিকেতন। বিকার বিহীন, কাম ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন।

অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর, অন্তরাত্মা অগোচর। সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর।

অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা রহিত, সর্ব্বজনহিত, ধ্রুব সত্য সর্ব্বাশ্রয়।

সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল, বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্বসাক্ষী অবিনাশ।

....

আহার উদরে, দেন সবাকারে, জীবের জীবন দাতা। রস রক্ত স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে, পান হেতু বিশ্বপাতা।

জন্মস্থিতি ভঙ্গ, সংসার প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে।"

ইহা হইতে রাজা রামমোহনে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ আমরা কতকটা বুঝিতে পারি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রাজর্ষি রামমোহন গাইলেন "স্মর পরমেশ্বরে, অনাদি কারণে। বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।" ইহা যে বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা, তাহা ভাবুক ভিন্ন আর কেহ পরিগ্রহ করিতে পারে না।

অপূর্ব্ব এই জন্য যে, ইহা আর শুনি নাই। এই বিবেক এবং বৈরাগ্য প্রতি মানবেরই ধর্ম্ম সাধনে একমাত্র সহায়, ইহা পূর্ব্বেও ছিল, পরেও থাকিবে। প্রধান আচার্য্য মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তৎকথিত **বিবেক** এবং **বৈরাগ্যের**ই অনুসরণ করিলেন। তাঁহার পিতা বিপুল সম্পত্তির অধিপতি, ইন্দ্রিয় সেব্য তাবৎ ভোগ্যবস্তুই তাঁহার চারিদিকে বিন্যস্ত ছিল, তথাপি তিনি ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিকর সুখসেব্য কোন প্রিয় বস্তুতে আসক্ত না হইয়া স্বীয় অন্তরে স্থিত বিবেকের পরিচালনা দ্বারা **শ্রেয়কে** গ্রহণ করিলেন। তিনি বৈরাগ্য দ্বারা বাসনা নির্ব্বাণের জন্য একদিন **"কল্পতরু"** হইয়া আপনার রাজ-প্রাসাদতুল্য বাড়ীর বৈঠকখানার তাবৎ সুন্দর এবং মনোরম আসবাব ও চিত্রাদি দান করিয়া ফেলিলেন এবং পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য স্বীয় অঙ্গুলিস্থিত অঙ্গুরীয়কও অর্পণ করিতে ভুলেন নাই। এতদ্দ্বারা বিবেক ও বৈরাগ্য যে ধর্ম্ম সাধনে একমাত্র সহায়, তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার জীবনে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ আমরা অতিশয় উজ্জ্বলরূপেই দেখিতে পাই। তাঁহাতে বৈদিক এবং বৈদান্তিক দুই ভাবেরই প্রাবল্য দেখা যায়। বৈদিক ভাবে বিভোর হইয়া তিনি হিমালয়ে গমন পূর্ব্বক প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতির ঈশ্বর তুরীয় মহানের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলেন। কিন্তু তিনি শুধু বৈদিক ব্রহ্মদর্শনেই পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই। বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে অন্তরতর অন্তরতমরূপে দর্শন কয়িয়া তাঁহাতেই আনন্দিত হইলেন। তৎপ্রদত্ত উপদেশ—'ব্রাহ্মধর্ম্মের

ব্যাখ্যান' এবং তাঁহার রচিত সঙ্গীত আমাদের উক্তি প্রতিপন্ন করিবে।

রামমোহনের ন্যায় মহর্ষিও গায়ত্রী মন্ত্রেই উপাসনা করিতেন। এ উপাসনা তাঁহাদের উভয়েরই ব্যক্তিগত ছিল। কেন না, কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের জন্য মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া রামমোহন তাহাতে সাধারণের জন্য রীতিমত ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। স্বতন্ত্র গৃহে বেদ পাঠ হইত, সেখানে ব্রাহ্মণেতর কাহার ও প্রবেশাধিকার ছিল না। সমাজগৃহের বেদী হইতে মাত্র উপদেশ প্রদত্ত হইত।

গায়ত্রী মন্ত্রে ব্রহ্মোপাসনা সাধারণের তত উপযোগী নয় বিবেচনা করিয়া, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় অন্তরস্থ ঈশ্বর প্রেরণার অনুবর্ত্তী হইলেন এবং

'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি, শান্তং শিবমদ্বৈতম্'

এই আরাধনা মন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিলেন। ইহা যে তিনি স্বীয় হৃদয়ে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ দ্বারাই প্রণোদিত হইয়া করিয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের সম্বন্ধে একদা মহর্ষি বঙ্গচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"দেখ, আমি বসিয়া আছি, ব্রহ্ম সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া বলিলেন 'অহং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,' ; আমিও তাঁহাকে শুনাইয়া দিলাম, 'ত্বমানন্দরূপ-মমৃতং যদ্বিভাতি।' (১) এই আনন্দরূপমমৃতং ব্রহ্মে, যে মহর্ষি যোগানন্দে বিভোর ছিলেন, তাহা অনেকেই স্বচক্ষে

(১) আমরা একথা বঙ্গচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি।

দেখিয়া ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার যে, 'ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি' ভগবদ্গীতোক্ত এই অবস্থা হইয়াছিল তাহা শ্রদ্ধেয় গ, না, ঠাকুর কৃত সঙ্গীত হইতেও প্রমাণিত হইবে যথা—

সঙ্গীত।

প্রথম নাম ওঁকার ভুবনরাজ দেব দেব, জ্ঞান যোগে ভাব রে, তিনি তোমার সঙ্গে।

ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ, প্রাণ-প্রাণ হৃদয় নাথ, ভুলনারে তাঁরে।

রাগ সঙ্গীত মানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে, যাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবন ; ভয় কি অভয় দানে, তোষেন জগত জনে, দেখ রে আনন্দময়ে তিনি তোমার সঙ্গে।

এই যিনি, 'প্রাণ-প্রাণ হৃদয় নাথ—তাঁহাতেই তিনি যোগযুক্ত হইয়া ঋষিদের ন্যায় ভূমানন্দ রসে ডুবিয়া গেলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ হওয়াতে, তিনি শুধু মহর্ষি এবং প্রধান আচার্য্য হইয়াছেন তাহাই নহে, তিনি অনুবর্ত্তী ব্রহ্ম সাধকদিগের ধর্ম্ম-পিতা হইয়াছেন। মহর্ষিতে, ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা শ্রদ্ধাস্পদ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গীতেও অনেক ভাব পাই। তাহা এখানে দেওয়া গেল না। তবে মহর্ষির রচিত একটী প্রার্থনা সঙ্গীত আমরা এখানে দিতেছি যথা—

আলেয়া—একতালা।

দেহ জ্ঞান দিব্যজ্ঞান, দেহ প্রীতি শুদ্ধ প্রীতি ; তুমি মঙ্গল আলয়, (তুমি মঙ্গল আলয়)।

ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ, বিবেক বৈরাগ্য দেহ ; দেহ ও পদে আশ্রয়।

ব্রহ্মানন্দ কেশচন্দ্র সেন।

আশারচন্দ্র।

কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের প্রারম্ভেই মহর্ষি, তাঁহাতে আনন্দময় ব্রহ্মের প্রকাশ দর্শনে মোহিত হইয়া, তাঁহাকে 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রদান এবং ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্যপদে বরণ করেন। মহর্ষি যেরূপ আদি সমাজের বেদী হইতে উপদেশ দিয়া ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে সাক্ষ্যদান করিলেন, এবং বলিলেন 'আমি সেই 'অমৃতকে জানিয়াছি', তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দও টাউন হলে দাড়াইয়া সাক্ষ্য দিলেন এবং বলিলেন,—"আমার এই নরকতুল্য হৃদয়ে, ঈশ্বরকে অনেকবার দেখিয়াছি।" কেশবচন্দ্রের ব্রহ্মদর্শন সম্বন্ধে মহর্ষি অনেকবার সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন। ১৮৮৪ খৃঃঅব্দে কেশবচন্দ্রের স্বর্গারোহণের পর আমরা কয়েকটী বন্ধু, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে, মহর্ষিকে দর্শন করিতে যাই। কথা প্রসঙ্গে তিনি বলিলেন "তোমরা ব্রহ্মানন্দের ঋণ কি দিয়া শোধ করিবে? জীবন দিয়াও বলিবে কিছুই দেওয়া হইল না। তোমরা অরণ্যে বসিয়া রোদন করিতেছিলে—বাড়ী নাই, ঘর নাই, পিতামাতা নাই— এমন সময় একজন আসিয়া তোমাদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'দেখ, ভাই, কেঁদনা, আমাদের বাড়ী আছে, ঘর আছে, আমাদের মা বাপ আছেন।' এ ঋণ কি দিয়া শুধিবে?" বাস্তবিক কেশবচন্দ্র যে '**আশারচন্দ্র**' তাহার সাক্ষ্য মহর্ষিও উল্লিল্লিত বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন। পাঠক, কেবশচন্দ্রে

ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ বিস্তৃতরূপে তৎপ্রদত্ত বক্তৃতা, উপদেশ, তাঁহার প্রার্থনা পুস্তক, জীবনবেদ, ব্রহ্মগীতোপনিষৎ, যোগ প্রভৃতি গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। তবে তাঁহাতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশের বিশেষত্ব আমরা দিঙ্‌মাত্রে এখানে উল্লেখ করিব। তিনি একদিকে যেমন ব্রহ্মদর্শন, ব্রহ্মবাণী শ্রবণ এবং ব্রহ্মপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "মা তোর রূপেগুণে মোহিত হয়ে, হেসে হেসে মরে যাই," তেমনি অপরদিকে পরব্রহ্মকে তাঁহার প্রেম-পরিবার সহ দর্শন করিলেন। ১৮৭২ খৃঃ অব্দে মাঘোৎসবে যে নগর কীর্ত্তন গীত হইয়াছিল, তাহাতেই তাঁহার এই ভাব প্রকাশ পাইয়াছিল, যথা—

"সাধ মনে গিয়ে প্রেম ধামে, হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে; ও সেই অরূপ রূপ মাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরি, ভকত মণ্ডলীর মাঝারে; (পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরিরে)। এবার দেখাও নাথ সেই আনন্দ ধাম; রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেম ডোরে।"

এইরূপে ব্রহ্মকে তাঁহার পরিবার সহ স্বীকার করাতে—নববিধানের বীজ যে তাঁহাতে প্রথম হইতেই ছিল, তাহা মুক্ত কণ্ঠে বলা যায়। ইহা হইতেই যথা সময়ে তাঁহার জীবনে আর্য্য ঋষিদের সমাগম, মুসা সমাগম, ঈশা সমাগম, চৈতন্য সমাগম, শাক্য সমাগম, মহম্মদ সমাগম, সক্রেটিস সমাগম এবং অন্যান্য সাধু মহাজনদিগের সমাগম হইয়াছিল।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের আর একটী বিশেষত্ব—ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ। তাঁহার এই 'বাণী শ্রবণ' লইয়া স্বদেশে ও

বিদেশে, তুমুল আন্দোলন হইয়াছে। এবং তাহার ফলে **সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের** উৎপত্তি হইয়াছে। এই "আদেশ বাদের" আন্দোলন ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কুচবিহারের বিবাহ ব্যাপার হইতে আরম্ভ হইলেও, আমরা তাঁহার জীবনে "ব্রহ্মবাণী" শ্রবণের তত্ত্ব প্রথম হইতেই শুনিয়া আসিয়াছি। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে কেশবচন্দ্র ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে পর, ১১ই মাঘ সোমবার যে নগর কীর্ত্তন হয়, আমরা তাহাতে ব্রহ্মবাণী শ্রবণের তত্ত্ব পাই। অবশ্য নগরকীর্ত্তন বাহির হওয়ার পূর্ব্বেই আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ, বেদী হইতে 'ব্রহ্মবাণী শ্রবণ' সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করেন। (১) তদনুসারে সেই সময়, ভক্ত ঠাকুরদাস সেন এবং ঋষি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, দুই জনে দুইটী নূতন সঙ্গীতও রচনা করিয়া গাহিয়াছিলেন। ঠাকুরদাসের সঙ্গীত এইরূপ "কথা কও, কথা কও, কথা কও, দয়াময়; পাপীর সঙ্গে কও কথা, শুনে বড় আশা হয়" ইত্যাদি। বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীতে আছে। তাহার ধ্রুবপদ এই 'পিতা কও কথা, তোমার কথা শুনে, তাপিত প্রাণ করি শীতল।' ইত্যাদি। উল্লিখিত কীর্ত্তনাংশ এখানে দেওয়া গেল যথা :—

"জীবনের মহাযোগ কর রে সাধন, বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন, জীবে দয়া, নামে ভক্তি, কর এই সার, (ওরে মন আমার) সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার, (ওরে মন আমার) পিতার **মধুর বাণী** শুনি শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে, সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মন প্রাণে।"

এখানে কয়েকটী মূল তত্ত্ব দেখা যায় :—(১) জীবনের

(১) ইহা শ্রুত নহে; লিখক স্বয়ং সাক্ষী।

মহাযোগ সাধন করা। (২) বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্মকে দর্শন করা। (৩) জীবে দয়া করা। (৪) ভক্তির সহিত নাম গ্রহণ, শ্রবণ ও কীর্ত্তন সার করা। (৫) ভক্ত হয়ে হরি পদে পড়ে থাকা। (৬) পিতা-ব্রহ্মের **বাণী** শ্রবণ করিয়া আনন্দে তাঁহার সেবা করা।

আমাদের মনে হয়, এই সব তত্ত্ব, বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে বিশেষ ভাবে সেই সময়ে মুদ্রিত হইয়াছিল এবং তিনি জীবনের মহাযোগ—ব্রহ্মযোগ সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, ব্রহ্মানন্দের অনুসরণে, একে একে সমুদয় গুলিই সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রামমোহন-কথিত **বিবেক** ও **বৈরাগ্য** গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ধর্ম্মজীবনের আরম্ভ সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন "আমি **বিশ্বাস**, **বিবেক** এবং **বৈরাগ্য** এই তিন উপাদান লইয়া জন্মিয়াছি।" বস্তুতঃ এ তিন উপাদান বীজাকারে প্রতি মানবেই আছে। কিন্তু কেশবচন্দ্রে তাহার পরিমাণ অধিক থাকাতেই তাঁহার এই উক্তি। রাজর্ষি রামমোহন **বিবেক** প্রধান ছিলেন এবং এজন্যই চতুর্দ্দশ বৎসর বয়ঃক্রমেই পিতার সহিত মতদ্বৈধ হওয়াতে, গৃহ ছাড়িয়া তিব্বত পর্য্যন্ত গমন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথে **বৈরাগ্যের** পরিমাণ অধিক ছিল, সুতরাং পিতার অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রে **বিবেক ও বৈরাগ্য সহ, বিশ্বাস** বিশেষ ভাবে থাকাতে তাঁহার বিশেষত্ব। তাঁহার এই বিশ্বাস মহর্ষি ঈশার বিশ্বাসের অনুরূপ। বিশ্বাস সম্বন্ধে ঈশা

বলিলেন 'তোমাদের যদি সর্ষপ-কণা তুল্য বিশ্বাস থাকে তবে, এই সম্মুখস্থ পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তরিত হও, অমনি উহা স্থানান্তরিত হইবে এবং তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব রহিবে না।' তিনি আরও বলিলেন—"তোমরা কল্যকার জন্য চিন্তা করিওনা, কল্যকার দিন, আপনার চিন্তা আপনি করিবে।" দেবনন্দন ঈশার বিশ্বাস লইয়া কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং কল্যকার জন্য চিন্তাবিহীন হইয়া মহাপ্রভুর কার্য্য আরম্ভ করিলেন। তিনি জীবনের কার্য্যারম্ভের প্রথম ভাগেই **প্রকৃত বিশ্বাস** (True Faith) লিখিলেন এবং তাহাতে বলিলেন "বিশ্বাস সাক্ষাৎভাবে **ঈশ্বর** এবং **মানবের অমরত্ব** দর্শন করে।"

কেশবচন্দ্রের এই **বিশ্বাস**, তাঁহার জীবনের বিবেক ও বৈরাগ্যসহ যে একটী বিশেষ উপাদান, আমরা দিঙ্মাত্রে ইহা প্রদর্শন করিতেছি।

সুধীগণ পূর্ব্বে দেখিয়াছেন, রাজর্ষি রামমোহন ব্রহ্মের আরাধনা জন্য তাঁহার স্বরূপ সম্বন্ধে আর কিছুই বলেন নাই, শুধু তিনি আছেন এবং সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরাধনার মন্ত্র, উপনিষৎ আলোচনা করিয়া স্বীয় অন্তরের প্রেরণানুসারে—

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি শান্তং শিবমদ্বৈতম্"

এইরূপ ব্রহ্মস্বরূপ নির্ণয় করেন, এবং তদনুসারে আরাধনা প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মের পুণ্য স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষ

প্রকাশ পায় নাই। কেশবচন্দ্র সেই অভাব প্রথমেই অনুভব করিয়া মহর্ষিকে তাহা জ্ঞাপন করেন। তখন মহর্ষি অনুসন্ধান করিয়া ঋষি-বাক্য হইতে 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' এই বাক্য তাঁহাকে দেখাইয়া দেন। ঈশ্বরের এই পুণ্যস্বরূপের আরাধনা কেশব জীবনের আর একটী বিশেষত্ব। তাহাতেই তাঁহার পাপবোধ অতি প্রবল। সে জন্য আপনাকে শুধু পাপী বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না—"আমি পাপীর সর্দ্দার" বলিলেন।

কেশব চন্দ্রের আর একটী বিশেষত্ব তাঁহার শিশু প্রকৃতি। তাঁহার 'জীবন বেদ' পাঠ করিলেই ইহা অনায়াসে উপলব্ধ হয়। 'জীবন বেদে' তিনি বলিলেন "আমার শিষ্য প্রকৃতি"। এই শিষ্য প্রকৃতিই শিশু প্রকৃতি। মনুষ্য সন্তান যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন সে তাহার একমাত্র সম্বল ক্রন্দন লইয়া সমাগত হয়। এই ক্রন্দনেই জানা যায়, শিশু মৃত নহে, জীবিত। এই ক্রন্দনেই শিশু আপনার প্রয়োজনীয় তাবৎ প্রাপ্ত হয়। পবিত্রাত্মা-জাত মানব সন্তানেরও এই অবস্থা। ব্রহ্মানন্দ, এজন্য তাঁহার 'জীবন বেদের' প্রথম অধ্যায়, বলিলেন প্রার্থনা। শিশুর প্রকৃতি-গত প্রথম শক্তি ক্রন্দন ; দ্বিতীয় শক্তি, শিষ্য হইয়া যাহা দেখে ও শোনে, তাহা শিক্ষা করা। আর শিশু মাকে যে বিশ্বাস করে এবং মাতার উপরে যে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, মনে হয়, তাহা দেখিয়াই দেবনন্দন ঈশা শিশুদ্বারা স্বর্গ পূর্ণ বলিয়াছিলেন। ঈশা বলিলেন ঃ—

"এই ক্ষুদ্র শিশুদিগকে আমার নিকট আসিতে দেও, নিবারণ করিওনা। কারণ ঈদৃশ লোকেরাই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকারী।" —মার্ক, ১০।১৪।

"আমি তোমাদিগকে সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যদি তোমরা হৃদয়কে পরিবর্ত্তন করিয়া ক্ষুদ্র শিশু সন্তানদিগের মত না হও, তোমরা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। অতএব যে ব্যক্তি এই শিশুর ন্যায় আপনাকে নম্র করিবে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।" মথি—২৮।৩-৪।

আমরা অতি সংক্ষেপে আচার্য্য কেশবচন্দ্রে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে এই উল্লিখিত কথা কয়টী মাত্রই বলিলাম। কেননা তৎসম্বন্ধে সঙ্গীতাচার্য্য ত্রৈলোক্যনাথ কৃত সঙ্গীত পুস্তকে সুধীগণ বহুল প্রমাণ পাইবেন। আমরা একটী মাত্র সঙ্গীত এখানে দিতেছি যথা ঃ—

ঝিঝিট। তাল—মধ্যমান।

কিরূপ দেখালি, জননী, ভুবন মোহিনী।
ভক্ত কোলে ভগবতী, ভক্তচিত্ত হারিণী।
দক্ষিণে পবিত্র যিস্থ, পুণ্যরবি দেবশিশু; বামে শোভে প্রেম চন্দ্র, গৌর গুণমণি।
সাধ হয় এরূপে তোরে, দেখি মা গো প্রাণ ভরে; পাদপদ্ম হৃদে ধরে, থাকি দিন যামিনী॥

অন্তরে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ
ও
আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র।

প্রেমদাস গাহিলেন—"ধ্যানে জ্ঞানে যারে, ধরিতে না পারে, সেই ব্রহ্ম সনাতন; হৃদয়ে হৃদয়ে, গোপনে পশিয়ে, করেন হরণ মন।" অন্যত্র গাহিলেন "অনন্তের টানে, অনন্তের

পানে ধায় প্রাণ-নদী বাধা নাহি মানে; বাঁধা আছি যাঁর সনে প্রাণে প্রাণে, তাঁহাকেই প্রাণ চায়।” এই যে অনন্ত ঈশ্বরের জন্য মানবাত্মার প্রাণের টান, ইহা চিরকাল আছে এবং চিরকালই থাকিবে। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বর আপনার প্রেমের টানেই মানব হৃদয়ে বাস করেন। এবং মানবাত্মাও প্রেমের টানেই, ঈশ্বরকে দর্শনের জন্য, তাঁহার বাণী শ্রবণের জন্য এবং তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শের জন্য, একান্ত ব্যাকুল হয়। এই ব্যাকুলতা, প্রতি মানবের স্বভাবে নিহিত থাকা সত্ত্বেও সকলে তাহা সকল সময় অনুভব করিতে পারে না। সকল সময় কেন অনুভব করে না, তাহা শ্রীমন্মহর্ষির ভাবে, শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর যে সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন তাহা এই ঃ—

রাগিণী কাফি। তাল—যৎ।

আমি হে, তব কৃপার ভিখারী।

সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে; তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।

প্রাসাদ কুটীরে, এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার; তেমতি দেব, তোমার দয়া হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার।

এই মোহ মানুষকে অন্ধকারে ঘুরায়। মানুষ মোহে পড়িয়া ঈশ্বরকে দেখিতে না পাইলেও ঈশ্বর তাহাকে কখনও ছাড়েন না। মানুষকে ঈশ্বর ছাড়েন না—এ তত্ত্ব অতি পুরাতন। ‘একশাখী পরে, দু বিহগ বরে, সুখে বসবাস করে; উভে উভয়ের সখা, প্রেমে মাখা মাখা, দোঁহে দোঁহায় নিরখে রে’—এ তত্ত্ব ঋগ্বেদের

যুগ হইতে আর্য্য ঋষিদের নিকটে আসিয়াছে। তলবকার উপনিষৎ বলেন ঃ—

মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মামা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্তু।

অর্থ। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি যেন তাঁহাকে পরিত্যাগ না করি, তিনি আমা কর্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন।

বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন ঃ—

তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ
প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা॥ বৃহ, ৩।৪.৮।

অর্থ। সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম যে এই পরমাত্মা, ইনি পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয় ও আর আর সকল হইতে প্রিয়।

ঈশ্বর যে প্রতি মানবের হৃদয়ে স্থিতি করিতেছেন, তৎসম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদের অনুভূতি কেমন পরিষ্কার; তাহা উল্লিখিত ভাবে এখানে দেওয়া গেল। ইহা মানবাত্মার অনুভূতি। তবে এ সম্বন্ধে ঈশ্বর স্বয়ং কি ভাবে মানবের হৃদয়ে স্থিতি করিয়া তাহার নিকট আপনার পরিচয় আপনি দিয়াছেন তাহারও একটু আভাস আমরা পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। কেন না, আমরা দেখিতে পাইব যে, শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে এই দুই ভাবই প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রায় তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর য়িহুদি ধর্ম্মের অন্যতম প্রেরিত পুরুষ ঈশায়াকে বলিতেছেন ঃ—

Can a woman forget her sucking child, that she should not have compassion on the son of her womb? Yes, they may forget, yet will I not forget thee.—Isa, xlix. 15.

অর্থ। কোন স্ত্রীলোক কি তাহার স্তন্যপায়ী শিশুকে এরূপ বিস্মৃত হইতে পারে যে, তাহার সেই নিজ গর্ভজাত সন্তানের প্রতি স্নেহ অনুভব করিবে না? বরং তাহারাও বিস্মৃত হইতে পারে, তথাচ আমি তোমাকে কখন বিস্মৃত হইব না।

এই পুরাতন তত্ত্ব **নব বিধানে** নবভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম সমাজের মহাত্মা-ত্রিতয়ে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। পাপী সাধুনির্ব্বিশেষে প্রতি মানব হৃদয়ে যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ হইয়া থাকে, আমরা তাহাই এখানে আলোচনা করিতে যত্ন করিব।

আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, মানব হৃদয়ে যে ঈশ্বর স্থিতি করিতেছেন তাহার দুইটী প্রমাণ। (ক) মানবের নিজের অনুভূতি—যাহা চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকিবে। (খ) ঈশ্বরের জীবন্ত ও বলপূর্ণ বাণী—যাহা মানবাত্মাকে প্রত্যাদিষ্ট প্রবক্তা করে এবং আশা ও বিশ্বাসে পরিবর্দ্ধিত করিয়া শান্তি, আরাম ও আনন্দ দান করে। নববিধানে, পুরাতন সকল বিধানের মিলন হইয়াছে। সুতরাং নববিধান-বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়ে সকল বিধানের ভাব বিকশিত দেখিতে পাওয়া যায়। আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে সেই সকল ভাবই যে উদ্ভূত হইয়াছিল পরবর্ত্তী পৃষ্ঠা সমূহ তাহাই প্রমাণ করিবে। উল্লিখিত (ক) এবং (খ) দুইভাব বিশেষ রূপে বঙ্গচন্দ্রে বিকশিত দেখা যায়। (ক) ভাবের বিকাশ যথা—

"আমার অস্তিত্বের মূলে তুমি বর্ত্তমান, চৈতন্যের মূলে জ্ঞান;
আমি তব প্রেমে প্রেমী, ইচ্ছাতে আমার তব ইচ্ছা দীপ্যমান।

তুমি যারে যে প্রকারে, সাজাও এ সংসারে, সেই সাজে সে প্রকার ; সকলি প্রকৃতি তুমি মাত্র পতি, করিছ লীলা বিহার। (প্রকৃতির বক্ষে) তব পুণ্যের অনলে সঁপিয়ে পরাণ, হইব আমিত্ব শূন্য ; ভকতির জলে করিয়ে সেনান (স্নান) হইব হে শ্রীচৈতন্য।

(খ) ভাবের বিকাশ যথা :—

আউলে স্থর—একতালা।

জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান।
নিত্যকাল আছিরে সঙ্গে, দিতে তোরে পরিত্রাণ।
আমিরে তোর প্রাণেশ্বর, আমাকে ভেবো না পর, নিজস্ব বলিয়ে ধর, শুদ্ধ সুখী হবে প্রাণ।
হয়েছিস কত জঘন্য, তথাপিও আমি পুণ্য, তোর মলিন মনে করি শুদ্ধতা বিধান।
কত কাঁদিলি কাঁদালি, হয়ে পথের কাঙ্গালী, তথাপি তোর শুষ্কপ্রাণে, করিরে আনন্দ দান।
আমি জীব তোর, তুই আমারি, আমি তোরে, ছাড়্তে নারি, আমিরে তোর পিতামাতা তুই আমার স্নেহের সন্তান।

এখানে দুইটী ভাব কেমন মিলিয়াছে। ঈশ্বর বলিতেছেন (১) 'আমি রে তোর প্রাণেশ্বর' (২) 'নিত্যকাল আছিরে সঙ্গে দিতে তোরে পরিত্রাণ', (৩) 'আমি জীব তোর, তুই আমারি, আমি তোরে ছাড়্তে নারি, আমি রে তোর পিতা মাতা, তুই আমার স্নেহের সন্তান।'

মানুষের স্বীয় অন্তরে যে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ হয়, ইহাতেই, ইতর প্রাণী হইতে তাহার বিশেষত্ব ; আর মানবের স্বীয় অন্তরে

যে ব্রহ্মদর্শন ইহাই মুখ্য ব্রহ্মদর্শন। সৃষ্টিতে এবং মহাত্মাদিগেতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ দর্শন করা যায়। কিন্তু তাহা সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ ব্রহ্মদর্শন নহে, কেননা তাহা সৃষ্টির আবরণের ভিতর দিয়া এবং মহাত্মাদিগের বাক্য, চরিত্র এবং কার্য্যের ভিতর দিয়া দেখিতে হয়। বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ, জেন্দাবস্তা প্রভৃতি সর্ব্বকালের ধর্ম্মশাস্ত্র, মানব মাত্রেরই মহোচ্চ অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে নরনারী সাধারণের যে, ঈশ্বরের অর্চ্চনা বন্দনা করিবার অধিকার আছে, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দ লাভ করিবার অধিকার আছে, তাহা যেমন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল, তেমনি মহাত্মাগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। মহাত্মাদের জীবনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ দ্বারা ক্ষুদ্র মানবেরও যে সেই সকল লাভ করিবার এবং ভোগ করিবার অধিকার আছে, তাহাই চিরকাল প্রমাণিত হইয়াছে। মানব জাতি ক্রমোন্নতিশীল। এজন্য মানবের মহোচ্চ অধিকার সম্বন্ধে মহাত্মাদের যেরূপ পরিষ্কার অনুভূতি, সাধারণ মানবের তদ্রূপ অনুভূতি দেখা যায় না। ক্ষুদ্র মানবের অনুভূতি, মহাত্মাদের অনুভূতির তুল্য না হইলেও, কেহ ক্ষুদ্র মানবের অনুভূতিকে তুচ্ছ করিতে পারেন না। ঈশ্বরের প্রেম, পুণ্য, শান্তি, আনন্দের অনুভূতি পরিমাণে খুব কম হইলেও ক্ষুদ্র মানবেরও যে, সে সকলের অনুভূতি আছে, তাহা কে অস্বীকার করিবে? ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা, আমরা নববিধানে দেখিতে পাই, ঈশ্বর বলিতেছেন— "জীব তোর সঙ্গে আমি আছি বর্ত্তমান। নিত্যকাল আছিরে

সঙ্গে, দিতে তোরে পরিত্রাণ।" এই সর্ব্ব জীবের পরিত্রাণ দিবার জন্যই ঈশ্বর যুগে যুগে, দেশে দেশে ধর্ম্মবিধান করেন। বঙ্গদেশের এবং ভারতের পরিত্রাণের জন্যই ঈশ্বর ব্রাহ্মধর্ম্ম—নববিধান এ যুগে এদেশে প্রেরণ করিলেন। রাজা রামমোহন, এই নবধর্ম্ম বিধানের বীজ বপন করিলেন। ব্রহ্মোপাসনার অধিকার যে জাতি, বর্ণ নির্ব্বিশেষে প্রতিমানবেরই রহিয়াছে, ইহা তিনিই, ঘোষণা করিলেন। ইহাতে তিনি আমাদের ধর্ম্মপিতামহ হইলেন, এবং আমাদের ন্যায় নিতান্ত অস্পৃশ্য লোকের পক্ষেও ব্রহ্মোপাসনা করিবার পথ খুলিয়া গেল। রামমোহনের সময় যাহা আদি সমাজ মন্দিরের প্রাচীর চতুষ্টয়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময়ে তাহা প্রাচীর ভাঙ্গিয়া বাহিরে আসিল, এবং ক্রমে, কেশবচন্দ্র ও তাঁহার সহযোগীদের দ্বারা তাহা ভারতে, ব্রহ্মদেশে, সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইল।

প্রতি মানবের যে উচ্চ অধিকার রহিয়াছে, ইহা সে, স্বীয় অন্তরেই অনুভব করিয়া থাকে। প্রতি বস্তুতে যেরূপ অগ্নি বা উত্তাপ অবস্থিতি করে, তদ্রূপ জীবন্ত ঈশ্বর প্রতি মানবে অবস্থিতি করেন। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অথবা কোন জ্বলন্ত কাষ্ঠ খণ্ড অপর কাষ্ঠের নিকটবর্ত্তী হইলেও তাহা জ্বলিয়া উঠে। কাষ্ঠ জ্বলিয়া উঠে অর্থাৎ তাহার ভিতরের অগ্নি শক্তিপ্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়া পড়ে। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের ভিতরে জীবন্ত ঈশ্বরের ক্রিয়া আরম্ভ হইলে, দেখাগেল, বঙ্গদেশ

এবং দূরবর্ত্তী নানা স্থান হইতে বন্ধুগণ আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইতে লাগিলেন। এই মহা মিলনেই নববিধান হইল। মেঘ মালার ভিতরে যে উত্তাপ থাকে, তাহা যখন পরস্পর মিলিত হইতে থাকে তখনই বিদ্যুন্মালা দৃষ্ট হয় এবং তখনই গভীর মেঘ-গর্জ্জন শ্রুত হইয়া থাকে। মেঘের গভীর গর্জ্জনের পর যেমন অবিরল বারিধারা পতিত হইয়া ধরিত্রীকে উর্ব্বরা করিয়া প্রচুর শস্যের প্রসূতি করিয়া তোলে, তদ্রূপ বিধানের ব্যাপারে নরনারী সাধারণের যে মহোচ্চ অধিকার আছে, তাহা তাহাদের অন্তরে জাগিয়া উঠে। রামমোহনের আহ্বানে ভারত জাগিল এবং কেশবচন্দ্রের আহ্বানে ভারত আপনার ভিতরে যে দৈবশক্তি রহিয়াছে তাহা অনুভব করিয়া নিজের দুই পায়ের উপর ভর দিয়া মনুষ্য-সন্তান রূপে দাঁড়াইল ও দাঁড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিল, "থাকবনা আর এ পাপ রাজ্যে, ব্রহ্মলোকে যাব চলে। সুখে বাস করিব তথা ব্রহ্মকল্পতরু মূলে।" মানবের স্বীয় অন্তরে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা উল্লিখিত কয়টী কথা মাত্রই বলিলাম।

চতুর্থ অধ্যায়।

আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র

ও

ব্রহ্মের সপ্তস্বরূপের প্রকাশ।

আমরা আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ প্রদর্শন করিবার পূর্ব্বে তদবলম্বিত আরাধনার মন্ত্র এখানে উল্লেখ করিতেছি :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমানন্দরূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি।

সুধীগণ দেখিবেন, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র, উল্লিখিত পরিবর্ত্তিত মন্ত্র, আরাধনা কালে, ব্যবহার করিতেন এবং তদনুসারে আমরাও কেহ কেহ সেইরূপ করিয়া থাকি। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন বঙ্গচন্দ্রের নিজের নহে। আমরা বঙ্গচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, আচার্য্য কেশবচন্দ্রের দৃষ্টি এবিষয়ে আকৃষ্ট হওয়াতে, তিনি ধর্ম্মবন্ধুদের সহিত আলোচনা করেন যে "আমরা আরাধনাতে ব্রহ্মের আনন্দস্বরূপের আরাধনা সর্ব্বশেষে করিয়া থাকি ; কিন্তু আরাধনার মন্ত্র উচ্চারণকালে, আনন্দ স্বরূপ অগ্রে, অর্থাৎ সত্য জ্ঞানং অনন্তং স্বরূপের পরে, উচ্চারণ করিয়া থাকি ; ইহা সমীচীন নহে। সুতরাং আরাধনার প্রণালী অনুসারে, আরাধনার মন্ত্র উচ্চারণকালেও, আনন্দ স্বরূপ শেষে থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র, ইহা,

বাঞ্ছনীয় হইলেও, কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। কেন না, বেদীতে বসিয়া উদ্বোধনান্তে যখন আরাধনার মন্ত্র উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তৎকালে, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলিয়া, তিনি 'শান্তং' উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই, উপাসকমণ্ডলী, পূর্ব্ব অভ্যাস বশতঃ, অগ্রে 'আনন্দরূপমমৃতং' ধরিয়া দিলেন, সুতরাং তিনি আর পুনরায় উহা পরিবর্ত্তনের চেষ্টা করিলেন না। কিন্তু বঙ্গচন্দ্র, তদবধি, 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' বলিবার পরে, 'শান্তং শিবমদ্বৈতং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমানন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি' উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্ববাঙ্গলা নববিধান সমাজে উহা প্রতিষ্ঠিত করিলেন। তবে, এখানেও সকলে তাহা গ্রহণ করেন নাই।

ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশে যখন তাঁহার ব্রহ্মদর্শন একটু স্থিরতা প্রাপ্ত হইল, তখন বঙ্গচন্দ্র, 'ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নববিধান' কিরূপে বুঝিলেন, তাহাই তাঁহার প্রার্থনাতে প্রকাশ পাইয়াছিল। সেই প্রার্থনা সঙ্গীতাকারে এইভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

কীর্ত্তন। তাল—লোফা।

এস হে নরনারী, হয়ে প্রকৃত বিশ্বাসী ব্রহ্ম সনাতনে।
বিশ্বাসই ধর্ম্মের মূল, উপাসনাই সাধন বল, যাতে ধনী হবে জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য-ধনে।

একতালা।

ব্রহ্মের স্বভাবে দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান।
হলে নিষ্ঠাযুক্ত, ব্রহ্মভক্ত, পাবে তাঁর অনুসন্ধান।

হয়ে সরল অন্তর, ব্রহ্ম উপাসনা কর ; ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে,
মনে প্রাণে সঞ্চারিবে ব্রহ্মজ্ঞান। (উপাসনা করে দেখ)
স্বেচ্ছা রুচি বিসর্জ্জিয়ে, দেখ অকিঞ্চন হয়ে, হরি মাতা
হয়ে, কোলে নিয়ে, বুঝাবেন নববিধান। (হাবা শিশু হয়ে দেখ)
(সেই) জননী রূপ দেখ্‌বে যখন, হবে সকল আশা পূরণ ;
পাবে সহজে, হৃদি মাঝে, যোগ-ভক্তি-কর্ম্ম-জ্ঞান। (দয়াময়ীর দয়া গুণে।
সকল অভাব দূরে যাবে, চরিত্রে তাঁহারে পাবে,হবে দর্শন, শ্রবণ,
সাধু সমাগম, জীবনের অন্ন-পান। (চরিত্রে হরিকে পেলে)

তাল ফেরতা।

বিধাতার এই নবলীলা, করিলে ভাই অবহেলা, দগ্ধ হবে অনুতাপানলে।

এখানে একটী কথা বিবেচ্য এই ;—'ব্রহ্ম কৃপা-গুণে, মনে-প্রাণে সঞ্চারিবে ব্রহ্মজ্ঞান', ইহা অতি পুরাতন তত্ত্ব। যোগিঋষিদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসেও ইহা আমরা দেখি, যে, জীবনে ধর্ম্মসাধন করিতে প্রতি সাধকই 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্' এই তত্ত্বের উপরে বিশেষ নির্ভর করিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কৃত একটী সঙ্গীতে আমরা পাই—

বাহার—একতালা। ৮

ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলম্। পাশ-নাশ-হেতুরেষ ন তু বিচারবাগলম্।
দর্শনস্য দর্শনেন ন মনো হি নির্ম্মলম্ ; বিবিধ শাস্ত্র জল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলম্।

আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সময়ও আমরা দেখি—

।৩০

ব্রহ্মকৃপাহি কেবল সবে বল ভাই।
ব্রহ্মকৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই। ইত্যাদি।

সুতরাং উল্লিখিত সঙ্গীতে 'ব্রহ্ম-কৃপা-গুণে, মনে প্রাণে সঞ্চারিবে ব্রহ্মজ্ঞান' এ তত্ত্ব নূতন নহে। কিন্তু "**ব্রহ্মের স্বভাবে** দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান" এ তত্ত্ব অতি নূতন। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহা কুত্রাপি আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টির গোচরে আসে নাই। সুতরাং নিঃসংশয় চিত্তে বলা যায়, ইহা শ্রীমদ্‌বঙ্গচন্দ্রের সাক্ষাৎ ব্রহ্মদর্শনের লব্ধ ফল।

দেব-নন্দন মহর্ষি ঈশা, এ বিষয়ে, বিশেষ ভাবে, মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলিলেন "Be ye perfect, even as the Father in Heaven is perfect." অর্থাৎ তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার মত পূর্ণ হও। অবশ্য "স্বারূপ্য লাভ" হিন্দুশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মকে যে না দেখে, এবং ব্রহ্মের স্বভাব যে পর্য্যালোচনা না করে, সে কি প্রকারে তাঁহার মতন হইতে যত্ন করিবে? এ যুগে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সদলে, জন সাধারণের দৃষ্টি, এদিকে বিশেষ ভাবে, আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, "জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন, বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম, কর দরশন, জীবে দয়া, নামে ভক্তি কর এই সার; সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে, থাক অনিবার (ওরে মন আমার। পিতার মধুর বাণী শুনি শ্রবণে, সেব আনন্দে তাঁহারে সবে, কায় মন প্রাণে।" এই

যুগের এই নবতত্ত্ব, নববিধান ঘোষণার প্রায় দশবৎসর পূর্ব্বে বিঘোষিত হইয়াছিল। ১৮৭১ খৃঃ অব্দে যে নগর সঙ্কীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল তাহাতে ইহা প্রকাশিত হইয়াছিল। (ব্রহ্মসঙ্গীত খুলিলে দেখিতে পাইবেন)। আমরা কত শত শত লোক ইহা তৎকালে শুনিয়া ছিলাম। এ তত্ত্ব বঙ্গচন্দ্রের প্রাণকে যে স্পর্শ করিয়াছিল, তাহা অগ্রে বলা গিয়াছে। ইহার তিন বৎসর কাল মধ্যে তিনি প্রকাশ্যভাবে প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করিলেও, তাঁহার জীবনে প্রচার-কার্য্য ১৮৬৭ সাল হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। এই কার্য্যের সময়ই তিনি ইংরেজীতে লিখিত এক প্রবন্ধে পাঠ করেন—Improvement of the Whole man. পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্, মানবের অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে না দাড়াইলে, কে 'আত্মার সমগ্র উন্নতির' জন্য ব্যাকুল হইতে পারে? সুতরাং বঙ্গচন্দ্র তাঁহাকে "জীবনের ধ্রুবতারা" রূপে গ্রহণ করাতে, প্রথমেই দেখিলেন এবং বলিলেন "ব্রহ্মের স্বভাবে দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান।"

ঈশা বলিলেন "স্বর্গস্থ পিতার ন্যায় পূর্ণ হও," ব্রহ্মানন্দ বলিলেন "জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন", বঙ্গচন্দ্র বলিলেন "ব্রহ্মের স্বভাবে দেখ ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান।" এ তিনের কেমন পরস্পর মিল আছে, তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

এক্ষণে আমরা মূল বিষয়ের পর্য্যালোচনাতে প্রবৃত্ত হইতেছি।



১। সত্য স্বরূপের প্রকাশ।

ব্রহ্ম কৃপাগুণে যখন তাঁহার মনে-প্রাণে ব্রহ্ম জ্ঞানের সঞ্চার হইল, তখন বঙ্গচন্দ্র অনুভব করিতে লাগিলেন, স্ব-প্রকাশ ব্রহ্ম-সনাতন, তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া স্থিতি করিতেছেন, অথচ তিনি স্থানেতে এবং কালেতে যে অনন্ত, সেই অনন্তই রহিয়াছেন। তিনি, সেই সত্য গম্ভীর অটল বর্ত্তমানতার ভিতরে ডুবিয়া, তাঁহারই চৈতন্যে যে তিনি সঞ্জীবিত, তাহা অনুভব করিতে করিতে, যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা সঙ্গীতাকারে এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে—

বাহার—একতালা।

তুমি এখানে বর্ত্তমান্।
স্থান কালের অতীত স্বপ্রকাশ ভগবান্।

তুমি ধ্রুব সত্যবটে, আমা হ'তে আমার নিকটে,
প্রকাশিয়ে চিত্ত-পটে, রাখ আমারে চক্ষুষ্মান্।

অটল সত্য গম্ভীর, প্রদীপ্ত জ্ঞান মিহির,
অনাদি অনন্ত ব্রহ্ম অখণ্ড ভূমা মহান্।

সরল সুমিষ্ট তব, শুদ্ধ প্রসন্ন স্বভাব,
দেবতা হয় মানব, পাইলে তব সন্ধান।

দীন জনে দয়া করে, দেও হে বিশ্বাস অন্তরে,
আশ্বস্ত বিষয়ের সার, অদৃশ্য বস্তুর প্রমাণ)

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

আলেয়া—একতালা।

ওহে তুমি সাক্ষাৎ ভগবান্।

এই যে অন্তরে বাহিরে, সম্মুখে পশ্চাতে, রয়েছ বিরাজমান।

আছ হে সর্ব্বত্র সদা বর্ত্তমান্, সমুদয় ঘটনা তোমারি বিধান, না দেখে তোমারে, পাপের সাগরে, ডুবিয়ে হারাই পরাণ।

দেখিলে তোমারে বিশ্বাস নয়নে, জ্বলে পুণ্য-তেজ পাপ মলিন মনে, চিদাকাশে হয়, প্রেম চন্দ্রোদয়, মুখে তব গুণ গান (উঠে)।

এ স্থলে একটী কথা স্মরণ রাখা আবশ্যক। ভগবান্ যখন ভক্ত সাধকের নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশ করেন, তখন তিনি আপনার সমুদয় স্বরূপ সহ প্রকাশিত হন। কিন্তু সাধকের দৃষ্টি ও ধারণাশক্তির তারতম্যানুসারে এবং তাহার স্বাভাবিক রুচি ও ভাবানুসারে ভগবৎ প্রকাশের অভিব্যক্তির তারতম্য সাধকে হইয়া থাকে। আমরা এ স্থলে যে সকল সঙ্গীত উদ্ধার করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশের প্রমাণ করিতে যাইতেছি, তাহার প্রত্যেক সঙ্গীত এ কথার পরিচয় প্রদান করিবে।

২। জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ।

ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহা জগৎকে মোহিত করে, সংসারের মানুষকে বিস্ময়াবিষ্ট করিয়া দেয়। মহর্ষি ঈশা যখন অনুপ্রাণিত হইয়া পাহাড়ের উপরে

উপদেশ দিলেন, তাহা শুনিয়া অন্যান্য লোকেরা পরস্পর বলাবলি করিয়াছিল, "পূর্ব্বে কোন মনুষ্য এমন কথা ত বলে নাই।" আচার্য্য কেশবচন্দ্র যখন কলিকাতার টাউন-হলে দাড়াইয়া স্বর্গের তত্ত্ব প্রকাশার্থ বক্তৃতা করিলেন, তাহা শুনিয়া *The Statesman* পত্রের সম্পাদক লিখিলেন—When Keshub speaks world listens. অর্থাৎ 'যখন কেশবন্দ্র বক্তৃতা করেন, তখন সমগ্র মানবজাতি তৎপ্রতি মনোযোগ দেয়।' ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া কোন মনুষ্য যখন কথা বলে, তাহা অপর মানুষের মর্ম্ম স্পর্শ করে। শ্রীমদ্‌বঙ্গচন্দ্রে যখন ব্রহ্মের জ্ঞান-স্বরূপের প্রকাশ হইল, এবং সেই সময়ের প্রার্থনানুসারে যে সঙ্গীত রচিত হইয়া গীত হইল, তাহা শুনিয়া মানুষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। সে সঙ্গীত এই ঃ—

বেহাগ—একতালা।

আমি আছি, আমি আছি রে জীব, দেখ দেখ আমায় চাহিয়ে।
সম্পদে, বিপদে, সুখে কিম্বা দুঃখে রয়েছি তোমারে ঘেরিয়ে।

বিশ্বাস নয়ন, করি উন্মীলন, যথা তথা আমায় কর দরশন,
মায়ামোহ-পাশ হইবে বিনাশ, আমার শ্রীমুখ হেরিয়ে।

আমার বচন, করিয়ে শ্রবণ, হও রে সঞ্জীবিত সদা সচেতন,
ভয় বিভীষিকা, যত প্রহেলিকা, সকলি যাইবে ঘুচিয়ে।

দিতে পরিত্রাণ, অবোধ সন্তান, কতই যতন, কতই বিধান (আমার)
তোমাদের তরে, আমি ঘরে ঘরে, দিলাম স্বর্গদ্বার খুলিয়ে।

২য় সঙ্গীত।

জংলাট—আদ্ধা।

আমি পবিত্রাত্মা হরি এসেছি দ্বারে।
হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেও হে আমারে।
না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে আর মন উঠে না,
সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস না আমারে।
যে দেয় প্রেম করে ওজন, সে ত প্রেমিক নয় কথন,
সংসারের বণিক্ সে জন, থাকে সংসারে।
প্রেমকর সতী ভাবে, অসম্ভব সম্ভব হবে, বিহরিব
যুগলরূপে অন্তর বাহিরে।

ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিরা বলিলেন 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই তাঁহার নিজের পরিচয়। যোগবাশিষ্ঠ বলেন ঃ—

অশিরস্ক হকারাভমশেষাকারসংস্থিতম্।
অজস্রমুচ্চরন্তং স্বং তমাত্মানমুপাস্মহে॥ যো, ১৮।২৬।

অর্থ। 'যিনি মস্তকাদি অবয়ব রহিত, আকাশ সদৃশ ও সর্ব্বগত, এবং যিনি "আমি আছি" এই কথা অজস্রবার বলিতেছেন, সেই পরমাত্মাকে আমরা উপাসনা করি।' বাইবেল এবং কোরাণ এই জ্ঞান স্বরূপের বাণীতে পূর্ণ। সুধীগণ ঐ সকল গ্রন্থ পাঠে জানিতে পারিবেন, হজরত মুসা, ঈসায়া, এলিজা, এলিশা প্রভৃতি যিহুদি ধর্ম্মের প্রেরিত পুরুষগণ, দেবনন্দন ঈশা, সাধু পল প্রভৃতি খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণ এবং ইস্লামধর্ম্মের নেতা হজরত

মহম্মদ কেমন জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বরের জীবন্ত ও বলপূর্ণ বাণীতে প্রত্যাদিষ্ট হইয়াছিলেন। এখানেও বঙ্গচন্দ্রে ঈশ্বর বলিতেছেন ঃ—

৩য় সঙ্গীত।

আলেয়া—যৎ।

বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার।
বিশ্বাসী রেখেছে নাম জগতে আমার।
পেলে আমাতে বিশ্বাসী, আমি তার হৃদয়ে বসি, (করি)
জগতের উদ্ধারতরে বিধান বিস্তার।
আমার খেয়ে আমার পরে, (থেকে) তামার বুকের
ভিতরে, অবিশ্বাস করে আমায় পাষণ্ড সংসার।
বিশ্বাসী এই ভুমণ্ডলে, জায়গা পায় না কোন স্থলে,
কেবল আমার প্রেম কোলে মাথা রাখে তার।
আমি রে তার অন্ন জল, আমি প্রেম পুণ্যবল,
আমা ভিন্ন দেখে সকল শূন্য অন্ধকার।
বিশ্বাসী তনয় যখন, করে আমার বিধি পূরণ,
রক্তপাত করে, আহা, পৃথিবী তাহার।
বিশ্বাসীরে বলিহারি, আমার সর্ব্বস্বের অধিকারী,
(তার) সংসারে কি স্বর্গরাজ্যে পূর্ণ অধিকার।

৪র্থ সঙ্গীত।

আলেয়া জয়জয়ন্তী। ঝাঁপ তাল।

নূতন বিধানে এবার এই মম আকিঞ্চন।
বিশ্বাসী দাস-দাসী লয়ে করি নরকে স্বর্গ স্থাপন।
যারা কেবল আপনাদেরে, দাসদাসী বলে স্বীকার ক'রে,

অবাধে দিবে আমারে করিতে বিধি পূরণ ; আমি তাদের লয়ে সঙ্গে,
দাড়ায়ে এই পূর্ব্ববঙ্গে, পতিত দেশে করিব নববিধান স্থাপন।
বিশ্বাসী দাস দল বিনে, কে দেখ্‌বে আমায় ধরাধামে, কেমন
নববিধানে করিতেছি বিচরণ।

ঈশ্বরের জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ-বিষয়ক তত্ত্ব সঙ্গীতাকারে আরও লিপিবদ্ধ আছে, তৎসমুদায় এখানে দেওয়া গেল না। তাহা 'বিধান-সঙ্গীতে' দ্রষ্টব্য। এ স্থলে যাহা উদ্ধৃত করা গেল, তাহা হইতে সুধীগণ দেখিতে পাইবেন, পরব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপের প্রকাশ এই পূর্ব্ববঙ্গে অতি সহজ এবং স্বাভাবিক ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঈশ্বরের **'আমি আছি'** এই পরিচয় মুসার নিকট এবং যোগী ঋষিদের নিকট আসিয়া ছিল, ইহা পুরাকালের কথা। কিন্তু, তোমার নিকট, আমার নিকট, সেই পরিচয় এ যুগে, অতিশয় নূতন কথা। তিনি প্রতি নরনারীর হৃদয় দ্বারে দাঁড়াইয়া, বলিতেছেন 'হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেওহে আমারে' ইহা তাঁহার জ্ঞান স্বরূপের বিচিত্র প্রকাশ।

৩। অনন্ত স্বরূপের প্রকাশ।

ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ সম্বন্ধে অথর্ব্ব বেদে আছে—

অনন্তং বিততং পুরুত্রা-
নন্তমন্তবচ্চ সমন্তে।
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্
বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য। অথর্ব্ব—১০।৮।১২

অর্থ। চতুর্দ্দিকে এক অনন্ত বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে অনন্ত এবং অন্তবৎ উভয়ই আছে। যিনি স্বর্গলোকের প্রতিপালক অনন্ত ব্রহ্ম, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনি এই বিশ্বের ভূত ভবিষ্যৎ জানিয়া বিচরণ করিতেছেন।

যো বিদ্যাৎ সূত্রং বিততং যস্মিন্নোতাঃ প্রজা ইমাঃ।

সূত্রং সূত্রস্য যো বিদ্যাৎ স বিদ্যাদ্ব্রাহ্মণং মহৎ॥ ঐ ২০।৮।৩৭।

অর্থ। যে সূত্রে এই প্রজা গ্রথিত রহিয়াছে, সেই বিস্তৃত সূত্রকে, সূত্রের সূত্রকে যিনি জানেন, তিনিই সেই মহৎ ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান অবগত।

কঠোপনিষৎ বলেন ঃ—

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।

অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথন্তদুপলভ্যতে॥ কঠ ৬।১২।

অর্থ। তিনি বাক্য দ্বারা, কি মনের দ্বারা, কি চক্ষু দ্বারা কাহারও কর্ত্তৃক প্রাপ্ত হয়েন না। তিনি আছেন, এই কথা যে বলে, তদ্ভিন্ন তিনি অন্য ব্যক্তির দ্বারা কি প্রকারে উপলব্ধ হইবেন।

ঈশ্বরের অনন্ত স্বরূপ সম্বন্ধে শিখ ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, যথা ঃ—

রংগ মৈ রংগীন, রাগ রূপমৈ প্রবীন, আউর কহে পৈ নাদীন, সাধ অধনী কহীয়ত হৈ, পাইয়ৈ নহী পার। তেজপুংজমৈ অপার, সবব বিদিয়া উদার, অপার, কহীয়ত হৈ। হাথীকি পুকার পল পাবৈ পহুচত তহি চিটীকি চিকার পহলেহী সুনিয়ত হৈ। রাগমারু—মিরাবাই।

অর্থ। তুমি সকল রাগে রঙ্গীন, রাগ ও রূপে প্রবীণ, তোমার নিকট কেহ দুঃখী থাকে না; সাধুগণ তোমার অন্ত না পাইয়া তোমার অধীন হন। তোমার অপার তেজঃপুঞ্জ, তুমি সকল বিদ্যায় উদার, তোমাকে সকলে অপার বলে। হস্তীর চিৎকার তোমার নিকট পল মাত্রে উপনীত হয়, পিপীলিকার মৃদু ধ্বনি তুমি সর্ব্বাগ্রে শ্রবণ কর।

এই অনন্ত স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য কেশবচন্দ্রের ভাব, প্রেমদাস নিম্নলিখিত সঙ্গীতাকারে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভৈরবী। একতালা।

চিনি না জানি না, বুঝি না তাঁহারে, তথাপি তাঁহারে চাই।

(আমি) সজ্ঞানে, অজ্ঞানে, পরাণের টানে তাঁর পানে ছুটে যাই।

দিগন্ত প্রসার, অনন্ত আঁধার, আর কোথা কিছু নাই, তাহার ভিতরে মৃদু মধু স্বরে, কে ডাকে শুনিতে পাই ; আঁধারে নামিয়া, আঁধার ঠেলিয়া, না বুঝিয়া চলি তাই ;—আছেন জননী এই মাত্র জানি, আর কোন জ্ঞান নাই।

কিবা তাঁর নাম, কোথা তাঁর ধাম, কে জানে কারে সুধাই ; না জানি সন্ধান, যোগ ধ্যান জ্ঞান, ঘ্রাণে মত্ত হয়ে যাই ;—ডুবিব অতলে মহা সিন্ধু-জলে, যা থাকে কপালে ভাই।

এই অনন্ত স্বরূপ সম্বন্ধে প্রেমদাস অন্যত্র গাহিলেন যথা :—

"তোমাকে দেখিবার তরে, চাহি আকুল অন্তরে, জ্ঞান নেত্র করি উন্মীলন ; কোথাও না পাই অন্ত, অনাদি তুমি, অনন্ত, মহান্ গম্ভীর অতুলন। (আমি কোথা বা এলেম গো, না হেরি কুল কিনারা)।

খুজিতে পরমাত্মারে, হারাইনু আপনারে, গভীর অতলে নিমগন (হেথা কিছু নাই, কিছু নাই, একব্রহ্ম বিনা)।

অধ উর্দ্ধ মহাশূন্য, অসীম রহস্যে পূর্ণ, বিস্ময় রসে নিমগন, (উথলিয়া যে পড়ে লো, কত জ্ঞান, প্রেম পুণ্য)।"

দৈনিক উপাসনাতে যে দিন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রে এই অনন্ত স্বরূপের বিশেষ প্রকাশ হইয়াছিল এবং যখন তিনি উদ্দীপ্ত হইয়া প্রার্থনাতে তাহা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে একটী বিশেষ দিন। তৎকালে

দেবালয়ে উপস্থিত উপাসকমণ্ডলী তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া কে যে কোন্ অতলে চলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কেহই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। প্রার্থনান্তে ভাই দুর্গানাথ এই সঙ্গীত গাহিয়া তাহা রক্ষা করিতে যত্ন করিলেন, যথা ঃ—

ইংরেজি সুর। একতালা।

কর গো মা কর গ্রাস, রাখি না অপর সুখের আশ।

ধন-জন-মান-বিদ্যা-বুদ্ধি-জ্ঞান, যাহা কিছু প্রিয়, যে কেহ আত্মীয়, সকলি কর মা তুমি গ্রাস।

হারাই অস্তিত্ব, সকল সত্ত্ব, দেখাও মা তোমার সত্য প্রকাশ; জ্ঞানের জ্যোতি, উজ্জ্বল মতি, নয়নের জ্যোতি করুক প্রকাশ।

তুমি অনন্ত, কর সব অন্ত, হউক জীবন্ত বিবেক বিকাশ; কর চির-দিন, তব ইচ্ছাধীন, পুণ্যালোকে পূর্ণ হউক আকাশ।

মোরা সকলে, তোমার কোলে, নিত্যকাল তরে করি বসবাস; যেখানে বিহার করেন, প্রিয় যিশু আর প্রিয় যিশুদাস।

৪। প্রেম স্বরূপের প্রকাশ।

ঈশ্বরের প্রেম স্বরূপ প্রকাশিত হইলে, ভক্ত সাধকের নিকট সমুদায় সৃষ্টি রূপান্তরিত হইয়া যায়। তৎসম্বন্ধে ঋষিবাক্য এই দেখা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন ঃ—

ইদং সত্যং সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু, অস্য সত্যস্য সর্ব্বাণি ভূতানি মধু।

অর্থ। এই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর সমুদায় প্রাণীর মধুস্বরূপ, সমুদায় প্রাণীও এই সত্যের নিকট মধুরূপে প্রকাশবান্।

এখানে সত্যস্বরূপ বলাতে, ঈশ্বরের প্রেম স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। ঈশ্বর আপনার প্রেমের স্বভাব হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া, তাহার প্রতি জীবে শুধু নহে, প্রতি পরমাণুতে আপনার প্রেমের স্বভাব ঢালিয়া দিয়াছেন। তাহাতেই সৃষ্টি মধুময় হইয়া রহিয়াছে। প্রেমিকেরা চিরকাল ইহা অনুভব করিয়াছেন এবং চিরদিনই অনুভব করিবেন। 'পরের মুখে ঝাল খাওয়া যায় না' একটী কথা আছে, ইহা বড় সত্য কথা। ভগবানের প্রেমরস অপরের মুখে কেহ আস্বাদন করে না এবং করিতেও পারে না। লীলাময় পরমেশ্বর, প্রতি বস্তুতে আপনার প্রেম-লীলা প্রকটন করিয়া লীলারস আস্বাদন করিতেছেন। মানব-সন্তানে তাঁহার প্রেমস্বরূপের প্রকাশ যেরূপ উজ্জ্বল (ক) এবং বিচিত্র (খ), এরূপ অন্য কুত্রাপি নহে। এজন্য প্রেমদাস গাহিলেন ঃ—

ঝিঁঝিট। একতালা।

কত রঙ্গ জান তুমি রঙ্গময়ী মা গো আমার।
বিচিত্র এই বিশ্ব চারু, দৃশ্য রঙ্গভূমি তোমার।
কারে হাসাও, কারে কাঁদাও, মোহমন্ত্রে সবে নাচাও,
নিত্য নানা ভাবে সাজাও, মেরে ফেলে বাঁচাও আবার।

করে গেলেন যে অভিনয়, ক্রুশে হত মেরী তনয়, হয় নাই কভু হবার নয়, এমন রঙ্গ জগতে আর।

শ্রীগৌরাঙ্গ ভক্তরাজে মাতালে, সাজালে সন্ন্যাসীর সাজে; জগাই মাধাই তার মাঝে, দুঃখেতে করে হাহাকার।

সাজায়ে নব বিধানে, যতেক ভক্ত সন্তানে, নব বিধানের লীলা করিলে জগতে এবার।

(ক)। মানব সন্তানে ঈশ্বরের প্রেম-স্বরূপের প্রকাশ যে অতি উজ্জ্বল, তাহার দৃষ্টান্ত সাধু মহাত্মাদের জীবন। ঈশা, মুসা, চৈতন্য, নানক, জনক, শাক্যসিংহ প্রভৃতির জীবনে আমরা প্রেম স্বরূপের প্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। কিন্তু তাহা ছাড়া, অসংখ্য অসংখ্য প্রেমিক জগতে হইয়া গিয়াছেন, ও আছেন, যাঁহাদের জীবন লোক চক্ষু তত আকর্ষণ করে নাই।

(খ)। মানব সন্তানে প্রেমের প্রকাশ **বিচিত্র**, তাহা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক। বিচিত্র শব্দের আভিধানিক অর্থ—নানা বর্ণ-বিশিষ্ট, চমৎকার, বিস্ময়কর, রম্য, সুন্দর, এবং আশ্চর্য্য। প্রেমিকের জীবন যে এরূপ, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে আমরা **বিচিত্র** বলিতেছি এই জন্য, যে ইহার দৃষ্টান্ত মনুষ্য জীবন ছাড়া, অন্য কোথাও নাই। শুধু মানব সন্তানেরই ঈশ্বরকে প্রেম দিবার অধিকার আছে; এবং সেই প্রেম দিবার অধিকার, তাহার সজ্ঞানে এবং স্বেচ্ছায়। মানব সন্তানকে স্বাধীনতা প্রদত্ত হইয়াছে। সেই স্বাধীনতার সর্ব্বোচ্চ অধিকার **সজ্ঞানে** ও **স্বেচ্ছাক্রমে** ঈশ্বরকে প্রেম করা। ঈশ্বরকে সজ্ঞানে প্রেম করিতে হয়,—এ জন্য শাক্যসিংহ বলিলেন—'আমি বুদ্ধ', নিমাই পণ্ডিত (বিশ্বম্ভর) বলিলেন—আমি 'শ্রীকৃষ্ণে চৈতন্য', ঈশা বলিলেন—'তিনি, মৃত দিগের নহেন, কিন্তু জীবিতদিগের ঈশ্বর, কারণ (প্রেমিক) সকলে তাঁহাতে জীবিত।' এবং নবভক্ত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বলিলেন,—'ভক্তের নাম **চৈতন্য**'। প্রকৃতপক্ষে সজ্ঞান এবং স্বেচ্ছা ভিন্ন প্রেমের যথার্থ আদান প্রদান হয় না। ভাগবতে

ভগবদুক্তি এই—'সতী নারী যেরূপ সৎপতিকে প্রেমে বশ করে, তদ্রূপ আমার ভক্ত আমাকে প্রেমে বশীভূত করে।' সতী নারীর প্রেম সজ্ঞান ও স্বেচ্ছা মূলক, এজন্য তাহাই প্রেমিকেরা দৃষ্টান্ত স্বরূপ গ্রহণ করিয়া থাকেন। আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র, প্রেম স্বরূপের আরাধনাতে প্রবৃত্ত হইয়া এই সতী নারীর দৃষ্টান্তই চক্ষের সম্মুখে সর্ব্বদা রাখিয়াছিলেন।

এই প্রেমের প্রকাশে, জীবের প্রেম ঈশ্বরে লাগে, ঈশ্বরের প্রেম জীবে লাগে; তাহাতে যে ভক্তের আনন্দ হয়, হৃদয়ের ভাব উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা দ্বারা অন্তরে ব্রহ্মের প্রেম স্বরূপের প্রকাশ অনুভূত হয়। এই প্রেম-যোগানন্দ শ্রীমচ্চৈতন্যদেব অনুভব করিতেন এবং তাহার বিরহে একান্ত কাতর হইয়া পড়িতেন। এই আনন্দেই কেশবচন্দ্র 'ব্রহ্মানন্দ' হইলেন। বঙ্গচন্দ্রে, ব্রহ্মের প্রেম স্বরূপের প্রকাশ, তাঁহার ভাষাতেই প্রকাশ পাইবে। তিনি বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে দাড়াইয়া বলিলেন "আমি পবিত্রাত্মা হরি, এসেছি দ্বারে, হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেও হে আমারে"। বঙ্গচন্দ্র তাঁহাকে ষোল আনা প্রেম দিতে একান্ত আগ্রহান্বিত হওয়াতেই যে, তিনি তাহা বলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ঈশ্বরের স্বভাব যে, মনুষ্য সন্তান স্বতঃ তাঁহাকে কিছু দিতে উদ্যত না হইলে, তিনি তাহার নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করেন না। যে সমগ্র প্রেম তাঁহাকেই দিবে মনে করে, তাহার নিকটেই তিনি 'ষোল আনা প্রেম না দিলে তুষ্ট হইতে পারি না,' এ কথা প্রকাশ করিয়া বলেন। কেন না, তিনি **আশুতোষ**। যে তাঁহাকে যাহা দিয়া

তুষ্ট, তিনিও তাহার নিকট তাহা পাইয়াই সন্তোষ প্রকাশ করেন। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রে ব্রহ্মের প্রেম স্বরূপের প্রকাশ এইরূপে সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ আছে যথা :—

কীর্ত্তনের সুর।

প্রেমময়ী মা আমার, সঙ্গে ভক্ত পরিবার।
হাস্য পূর্ণ আস্য মায়ের ঝরে সুধা অনিবার।
মধুর হাসিনী মধুর ভাষিণী, কত সুমধুর ব্যবহার।

সুধা-মুখে সুধাবাণী, মৃত-প্রাণ-সঞ্জীবনী, মহাপাপীর হয় উদ্ধার (মায়ের কথা শুনে)।

এই আকাশময় মাতৃ-স্তন, করি প্রেম-দুগ্ধ দান, পালেন ভক্ত পরিবার। (স্তন্য সুধাদানে)।

হয়ে প্রেমে উন্মাদিনী, সন্তান-বৎসলা জননী, অবতীর্ণ হলেন এবার। (জীবের দুঃখে ব্যস্ত হয়ে)।

তোরা আয়রে ব্যাকুল মনে, মা ডাক্‌চেন, প্রেম-সম্বোধনে, ছাড় পাপ দুরাচার। (মায়ের কথা রাখ)।

ঈশ্বরের এই প্রেমস্বরূপ, আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রে, যে কত ঘনীভূত রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, সুনিপুণ পাঠক তাহা উল্লিখিত সঙ্গীতে দেখিতে পাইয়াছেন। একটী সঙ্গীতে আছে "আমি পবিত্রাত্মা হরি, এসেছি দ্বারে, হৃদয়ের সমগ্র প্রেম দেও হে আমারে। না দিলে প্রেম ষোল আনা, কিছুতে আর মন উঠে না, সংসারের উচ্ছিষ্ট প্রেম দিস্ না আমারে।" ইত্যাদি। এই ষোল আনা প্রেম, ঈশ্বরকে দেওয়া কিরূপ, তাহার দৃষ্টান্তও বঙ্গচন্দ্র অনেকবার

মহাভারত হইতে একটী গল্প উল্লেখ করিয়া বন্ধুদিগকে পরিগ্রহ করাইতে যত্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রেম সম্বন্ধে চীন দেশীয় শাস্ত্রে আছে—

"বিশ্বস্ততা ও সারল্য এই দুইটীকে সর্ব্ব-প্রথম তত্ত্বরূপে গ্রহণ কর।"

নববিধানেও আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ সর্ব্বপ্রথমেই এই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে—

"সরল প্রার্থনাই, মুক্তির সাধনা।"

সুতরাং যেখানে পূর্ণ বিশ্বাস এবং সারল্য, সেখানেই যে ষোল আনা প্রেমের বীজ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বিশ্বাস ও সারল্য সম্বন্ধে বঙ্গচন্দ্র,মহাভারতের যে পৌরাণিক কথা বন্ধুদিগকে বলিতেন, তাহা এই ঃ—পাণ্ডবগণ, যখন দ্রৌপদী সহ বনে বাস করিতে ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের দৈনিক আহার সংগ্রহের ভার, এক ভ্রাতার উপরে ন্যস্ত ছিল। তিনি সকলের জন্য আহার অন্বেষণ করিতে গিয়া, এক দিন এক বৃক্ষে একটী মাত্র সুপক্ক ফল দেখিয়া, তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনেন। অল্প সময় মধ্যে পাণ্ডবগণ জানিতে পারিলেন যে, ঐ সুপক্ক ফলটী একটী ঋষির দৈনিক আহার। তিনি তপস্যানন্তর সায়ংকালে আশ্রমে আসিয়া প্রতিদিন ঐ একটী ফল মাত্র ভক্ষণ করেন। পাণ্ডবগণের জন্য তাহাই আনা হইয়াছে, সুতরাং ঋষি সায়ংকালে আশ্রমে আসিয়া ফল না পাইলে, তাঁহাদিগকে অভিসম্পাত করিতে পারেন। পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ইহা চিন্তা করিয়া অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন, এবং তাহা নিবারণের সদুপায় কি হইতে পারে, তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিলেন।

স্মরণ মাত্র তিনি উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমরা প্রতিজন, যদি সরল ভাবে আপন আপন মনের কথা প্রকাশ করিতে পার, তাহা হইলে, এই ফল এখনই পুনরায় বৃক্ষ-শাখায় গিয়া সংলগ্ন হইবে। পঞ্চ পাণ্ডব, প্রতি জনে একে একে আপন আপন মনের গুপ্ত অভিসন্ধি, সরল ভাবে প্রকাশ করিলেন এবং তদনুসারে ফলটী ঊর্দ্ধে উঠিয়া বোঁটার নিকট পৌঁছিল। এক্ষণে দ্রৌপদীর মনের কথা সরলভাবে প্রকাশিত হইলেই উহা বোঁটাতে সংলগ্ন হইতে পারে। কিন্তু দ্রৌপদী লজ্জা বশত মনের কথা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে পারিলেন না, তখন ফল পুনরায় ভূমিতে পতিত হইল। তদ্দর্শনে ভীম, স্বভাবসুলভ ক্রোধপ্রবণতা বশতঃ দ্রৌপদীকে কঠোর বাক্যে শাসন ও প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ করিতে বলিয়া পুনরায় সকলকে সরল ভাবে মনের কথা বলিতে বলিলেন। এবার অন্যান্য সকলের ন্যায় দ্রৌপদীর মনের গুপ্ত কথা সরল ভাবে প্রকাশিত হওয়াতে, সেই ফলটী পুনরায় বৃক্ষশাখায় আপনার বোঁটাতে সংলগ্ন হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। শ্রীমতী দ্রৌপদী যে গূঢ় কথা প্রকাশ করিতে লজ্জিত হইয়াছিলেন, তাহা এই ঃ—তাঁহার মনে ছিল, পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় কর্ণও যদি তাঁহার স্বামী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সুখ হইত। (১)

(১) এই স্থলে উল্লেখ থাকা প্রয়োজন যে বঙ্গচন্দ্র, আপনাকে দ্রৌপদী এবং প্রচারক বন্ধুদিগকে পঞ্চ পাণ্ডব বলিয়া অনেক বার স্বীকার করিয়াছেন।

এই মর জগতে, প্রেমের পরাকাষ্ঠা, আমিত্ব পরিশূন্য হইয়া, একদিকে পরমাত্মার সঙ্গে এবং অপর দিকে সর্ব্ব জীবের সঙ্গে একাত্মা হইয়া যাওয়া। এজন্য চিরকাল ভক্তগণ প্রেমোন্মত্ততা প্রার্থনা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের প্রার্থনা প্রেমদাস এই ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যথা :—

পাগলা স্বর—একতালা।

আমায় দে মা পাগল করে। আর কাজ নাই জ্ঞান-বিচারে।

নূতন বিধানের সুরা, পানে কর মাতোয়ারা; ও মা ভক্ত-চিত্তহরা ডুবাও প্রেম সাগরে।

মা তোমার পাগলা গারদে, কেহ হাসে কেহ কাঁদে, কেহ নাচে আনন্দ ভরে; ঈশা, মুসা, শ্রীচৈতন্য প্রেমের ঘোরে অচৈতন্য, হায় কবে হব ধন্য মিশে তার ভিতরে।

স্বর্গেতে পাগলের মেলা, যেমন গুরু তেমনি চেলা, প্রেমের খেলা কে বুঝতে পারে; তুই প্রেমে উন্মাদিনী পাগলের শিরোমণি, প্রেম ধনে কর মা ধনী, কাঙ্গাল প্রেমদাসেরে।

বঙ্গচন্দ্রে এই প্রেমোন্মত্ততা পাঠক, "প্রেমময়ী মা আমার, সঙ্গে ভক্তিপরিবার" এই সঙ্গীতে কিঞ্চিৎ দেখিয়াছেন। এই প্রেমোন্মত্ততা আরও ঘনীভূত হইয়া যে প্রার্থনা হইয়াছিল, তাহা ভাই দুর্গানাথ এইরূপে সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন যথা :—

হরি বলে সবাই নাচে সুরে।

হরি নামে হরি প্রেমে, মন রে তুমি হও পাগল। মনের সাধে, হরি-পদে, ভক্তিতে লুটাও কেবল।

পাইলে বিশুদ্ধ প্রীতি, হরির সন্তোষ অতি, রূপে গুণে নন মোহিত প্রেমেতেই তুষ্ট কেবল।

রূপ, গুণ, যশো মান, থাকিলে সব কর দান, না হয় দিয়ে শুধু প্রাণ, পূজ হরি পদ কমল।

লয়ে গৌর পদ ধূলি, হরি প্রেমে যাওরে গলি, দিবানিশি বাহু তুলি, হরি হরি হরি বল।

প্রেম স্বরূপ সম্বন্ধে ভাই দুর্গানাথ-কৃত অন্যান্য সঙ্গীত মধ্যে আরও একটী সঙ্গীত এই :—

রাগিণী—তাল আদ্ধা।

সুকৃতি প্রেম প্রকৃতি, স্বর্গেতে বসতি গো।

হাসি হাসি ভাল বাসি, মিষ্টভাষী আমি গো।

জানি না কটু কর্কশ, ঝরিতেছে সুধারস, মধুর স্বভাব আমার ফুলের মতন; পর সেবাব্রত আমার অনন্ত জীবন গো।

স্বর্গে ভক্ত পরিবারে, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে, বেড়াই আমি সেবা করে, সবে অনুক্ষণ; করি আমি পুণ্য শান্তি মিলন বিধান গো।

ভক্তির পরিণতি প্রীতি। এই প্রীতি যেমন ঈশ্বরে, তেমনি জীব জন্তু প্রভৃতি তাবৎ প্রাণীতে বিস্তৃত হয়। কেননা, ভক্তিতে ভগবান্‌কে সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান দেখা যায়। এজন্য আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের সময়ে সঙ্গীত হইল "জলে হরি, স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি, সূর্য্যে হরি, অনল-অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।" প্রেম দাস সেই সময়ে 'নমোদেব' 'নমোদেব' এই সঙ্গীতে গাহিলেন— "বিশ্বব্যাপী ভগবান্, তুমি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান, জড়, জীব, তরু,

লতা সবাকার প্রাণ, তাদের ভিতরে, নিরখি তোমারে, করি বিনতি প্রণাম, কর বরাভয় দান।” এই সঙ্গে আরও গাহিলেন “এ বিশাল সংসার, তব প্রিয় পরিবার, নর নারী যত প্রকাশে মহিমা তোমার, স্ত্রীলোক বালক, শত্রু মিত্র সবে, বার বার নমস্কার ; তুমি সর্ব্ব মূলাধার।” যদিও এই সকল সঙ্গীত দ্বারা ব্রাহ্ম সমাজে সর্ব্বভূতে হরি দর্শনের আনন্দ সকলেই অনুভব করিয়া আসিতেছেন, তথাপি, যখন ভক্তি, বঙ্গচন্দ্রে, প্রীতিতে পরিণত হইল, তখন তাঁহাতে নবভাবে প্রার্থনা আসিল এবং সেই প্রার্থনা ভাই দুর্গানাথ এই ভাবে সঙ্গীতে গাহিলেন যথা :—

স্বর—তাল একতালা।

ও ভাই তুমি বা কে, আমি বা কে, ব্রহ্ম সন্তান বিনা ?

এই পিতা মাতায় স্বীকার করে, পাশরি যাতনা।

ওগো, তুমিই বা কে ভগিনি, (বল) কে তোমার জনক-জননী, এস সবে মিলে করি মায়ের চরণ বন্দনা।

শরীর মনের বিকার দেখে, আমরা চিন্‌তে নারি কেউ কাহাকে ; (ব্রহ্মমায়ের সন্তান বলে), সবে আছি এক মায়ের কোলে দেখ্‌লে সুখ ধরে না।

এই ভাবের আর একটী সঙ্গীত, যাহা শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র পরিবর্ত্তিত আকারে আপনি গাহিতেন তাহা এই :—

কীর্ত্তন—একতালা।

মা তুমি আনন্দময়ী, আছ লয়ে সবে প্রেম ক্রোড়ে।

তোমার গম্ভীর আবির্ভাব, করি অনুভব, পূর্ণ বিশ্বাসে অন্তরে বাহিরে।

তুমি চিন্ময়ী জাগ্রত, কোটি নেত্র-যুত, পাপপুণ্য যত, সকলি নেহার।

তোমার সুন্দর প্রেমাননে, সুমিষ্ট বচনে, ডাকিতেছ সবে, প্রেমভরে।

তোমায় দেখি ত্রি-নয়নে, বিশ্বাস-ভক্তি-জ্ঞানে, মহাযোগে যাই অমরপুরে। (মা তোর কোলে বসে)।

বস্তুতঃ, এই যে সকল মানবের একত্ব, ইহা দর্শন করিয়া আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ বলিলেন—"উপরে একমেবাদ্বিতীয়ং পিতা; আর নীচে একমেবাদ্বিতীয়ং পুত্র।" বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—"সবে আছি এক মায়ের কোলে দেখ্‌লে সুখ ধরে না। ও ভাই তুমি বা কে, আমি বা কে ব্রহ্ম সন্তান বিনা?"

প্রেমসিন্ধু ভগবান্ প্রেমিক ভক্তের নিকট আপনার প্রেমপূর্ণ সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া তাঁহার চিত্তকে প্রমুগ্ধ করেন এবং তদ্দারা ভক্তকে প্রেমের ব্রত পালনে আরও দৃঢ়-ব্রত এবং নিষ্ঠাযুক্ত করেন। তৎসম্বন্ধে স্বয়ং বঙ্গচন্দ্র তাঁহার সে ভাব সঙ্গীতাকারে যেরূপ নিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা এই। যথা—

ভৈরবী—একতালা।

তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী (ওহে করুণাময় স্বামী)

দেখিয়ে তোমার মুখ, শুনিয়ে তোমার বাণী, নিশি দিন থাকি নাথ, তোমার অনুগামী।

তোমার অবতীর্ণ-রূপ দরশন করি, সেবিব তোমার পদ, হয়ে আজ্ঞাকারী।

ভাবিব না ফলাফল, সুখ দুঃখ আমি, সকলি মঙ্গল মম, যাহা কর তুমি।

(মরণ মঙ্গল মম, যদি মার তুমি)।

৫। অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশ।

ব্রহ্মের অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশে দেখা যায়, ভূলোকে এবং দ্যুলোকে, সমুদায় মহিমা, পরাক্রম, গৌরব ও ঐশ্বর্য্য তাঁহারই; তিনি আদি, তিনি অন্ত, তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত; তিনি পিতা মাতা সকলই। এজন্য প্রেমদাস গাহিলেন ঃ—

"অখণ্ড সচ্চিদানন্দ বিশ্বজন বন্দন। নিত্য বিভু পূর্ণব্রহ্ম, একমেবাদ্বিতীয়ম্। অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, বিপদ্-ভয়-ভঞ্জন; সর্ব্ব সিদ্ধি দাতা কল্পতরু পরমাত্মন। তুমি গড্, খোদা হরি, জিহোবা জনার্দ্দন, পিতা মাতা সখা বন্ধু, তুমি অনন্ত শরণ।"

এই এক এবং অদ্বিতীয়রূপে যখন অন্তরে ব্রহ্ম প্রকাশিত হইলেন, তৎকালে শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের কণ্ঠ নিস্থত প্রার্থনা নিম্নে প্রদত্ত সঙ্গীতাকারে আছে; যথা ঃ—

সুর—একতালা।

এ চিত্ত জীবন, আমার নয় কথন, স্বামী ইহার স্বয়ং ভগবান্।

কি গৌরব, হে মানব, যাঁর ধন তাঁরে করিলে প্রদান।

যাঁর ধন তাঁরে প্রত্যর্পণ করে, পুণ্য-ধর্ম্ম কবে হয় এ সংসারে, না দিলে, ভূতলে, অপরাধী বলে হয় অপমান।

এ হেন স্বামীরে প্রেম না করিয়ে, এমন স্বামী পদে সর্ব্বস্ব না দিয়ে, অহঙ্কার ব্যভিচার, দহে অনিবার, আমার মলিন প্রাণ।

চিত্ত আর জীবন, স্বামীরে অর্পণ, করে ছিলেন শ্রীচৈতন্য মহাজন, হৃদয়ে, বাঁধিয়ে, তিনি পূজিলেন প্রাণেশের চরণ। (ভক্তিপুষ্প দিয়ে)

২য় সঙ্গীত। কীর্ত্তন।

এক অদ্বৈত ব্রহ্ম মা আমাদের।

মা আমাদের, মা আমাদের, আমরা মায়ের, মা আমাদের।

নিত্য সত্য ব্রহ্মরূপে আছেন জননী, ভক্তহৃদে লীলা করেন লীলা বিলাসিনী। (নানা রূপে নানা ভাবে রে)।

মানব স্বভাব আমাদের রাখিয়ে বজায়, এবার মুক্তি দিবেন ব্রহ্মমাতা আপনার কৃপায়। (ভয় ভাবনা দূরে গেল রে)।

ব্রহ্ম আমাদের জননী, আমরা সন্তান, এস প্রার্থনা যোগেতে করি স্তন্য সুধা পান। (মায়ের কোলে বসে রে)।

৩য় সঙ্গীত।

দ্বাদশ সাম্বৎসরিক উৎসবে।

(১২৯৯ সাল, ২৮শে ভাদ্র, নগর কীর্ত্তন।)

পূর্ণ ব্রহ্মের পূর্ণ ধর্ম্ম কর গ্রহণ।

দেখ নয়ন ভরে, চরাচরে পুণ্যময়ের অবতরণ।

তরুলতা ফুল ফলে, অনল অনিল জলে, ঐ রবি শশি তারা দলে, বসে আছেন সেই সনাতন।

দারা সুত পরিবারে, আপনার মলিন অন্তরে, সেই এক প্রাণেশ্বর বিরাজ করেন, দিবার তরে নবজীবন।

হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান, ব্রাহ্ম আর খৃষ্টিয়ান, ব্রহ্ম সব দলেই বর্ত্তমান, বিশ্বাসীরে দিতে চরণ। (গুরু, সখা, প্রভু হয়ে)।

ব্রাহ্মধর্ম্ম ব্রহ্মজ্যোতি, সাধনে পায় কার শকতি, ব্রহ্ম কৃপাকরে বিলান যারে, সেই লভে সেই অমূল্য ধন।

অন্য সুর।

তাই বলি ভাই, বিবাদে কাজ নাই, এক ঈশ্বর উপাস্য সবাকার। (এস) ছেড়ে দলাদলি, ঈশ-প্রেমে গলি, দেই প্রাণ-মন উপহার। (ও সেই ঋষি-পূজ্য ব্রহ্মপদে) (ঐ জিহোবা খোদার পদে) (ঐ সুন্দর শ্রীহরি পদে)।

এই ব্রহ্মতেজে তেজস্বী হয়ে, পাপ অবিশ্বাসে দেই তাড়াইয়ে, (ব্রহ্মরাজ্য হতে), (মানব জাতি হতে)।

মায়ের প্রেম-রাজ্য ধরায় আনিতে, জীবন ঢেলে দেই সেই প্রেমাগ্নিতে। (জ্বল্‌ছে যে আগুন ঈশা জীবনে), (জ্বল্‌ছে যে আগুন গৌর জীবনে) (জ্বল্‌ছে যে আগুন নববিধানে)।

আমরা পূর্ব্বে অনন্ত স্বরূপের প্রকাশ আলোচনা কালে এক বিশেষ দিনের উল্লেখ করিয়াছি। অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধেও দৈনিক উপাসনার একটী বিশেষ দিন, তদ্রূপ আমাদের চিত্তফলকে চিরদিনের জন্য, মুদ্রিত হইয়া রহিয়াছে। সে দিন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের হৃদয়ে, সেই ইচ্ছাময় পরম পুরুষ একমেবাদ্বিতীয়ম্, এমনি উজ্জ্বলরূপে আপনাকে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, বঙ্গচন্দ্র জীবন্ত ও বলপূর্ণ বাণীতে যখন তাঁহার প্রার্থনা শেষ করিলেন, তখন উপাসক মণ্ডলী প্রতিশব্দে এবং প্রতি বাক্যে, ভাই দুর্গানাথের কণ্ঠের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া নিম্নলিখিত সঙ্গীত তার স্বরে গাহিয়াছিলেন।

ফিকিরচাঁদের সুর—লোফা।

ইচ্ছা পূর্ণ কর, প্রাণেশ্বর, কেবল তোমার ইচ্ছা মত।
আমাদের স্বেচ্ছা রুচি, ভাল মন্দ বাসনা কামনা যত; করে চূর্ণ সব,
প্রাণ বল্লভ, হও হে, তুমি প্রকাশিত (তোমার মনের মত)

মোরা যে অবিশ্বাসে, অহঙ্কারে, ধর্ম্মের অভিমানে মৃত, বিশ্বাসী সনে,
(১) বসে প্রাণে, কর সবে সঞ্জীবিত।
দীনহীন কাঙ্গাল যারা, পথহারা, ভাল মন্দ বুঝে না ত, নেও হে হাতে
ধরে, ভব-পারে, যেখানে সবাই জীবিত।
তুমি যে নিজগুণে, পাপীর সনে, কর্‌ছ ব্যভার ইচ্ছামত, এইটা দেখে-
শুনে, শ্রীচরণে, কৃতজ্ঞতায় হই প্রণত। (চিরদিনের মত)

এস্থলে বিশেষ ব্যক্তব্য এই যে, আমরা এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ লিপিবদ্ধ করিলেও, পাঠক, শুধু বঙ্গচন্দ্রের অন্তরেই, আরাধনাতে, প্রার্থনা-ও-সঙ্গীতে ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ আবদ্ধ ছিল, এরূপ কখনও মনে করিবেন না। সমবেত উপাসনার একটী অভূতপূর্ব্ব বিশেষ প্রভাব এই যে, একজন পবিত্রাত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলে, উহা অল্পাধিক পরিমাণে সমানান্তর ভাবাপন্ন উপস্থিত সমগ্র বিশ্বাসী মণ্ডলীকে স্পর্শ করে। যাহারা Galvanic Battery—বিদ্যুজ্জনক যন্ত্র—দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন, এক জন যখন ঐ ক্রিয়াশীল যন্ত্র স্পর্শ করে তখন সেই ব্যক্তিতে তাড়িতের কার্য্য আরম্ভ হইয়া তাহাতে সংলগ্ন তাবৎ ব্যক্তিতে তাড়িত ক্রিয়া চলিতে থাকে। এইরূপ পরস্পরের সংস্পর্শে সমবেত সকল লোকের মধ্যেই তাড়িত সঞ্চারিত হয়। ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার কার্য্য এইরূপ; একজনের সংস্পর্শে সমানান্তর ভাবাপন্ন বহু লোকের অন্তরে তাঁহার কার্য্য হইয়া থাকে। আমরা শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের সঙ্গে মিলিত যে ক্ষুদ্র

(১)। বিশ্বাসী—যিসু এবং যিসুদাস—কেশব।

উপাসক মণ্ডলীর কথা বলিতেছি, তাহাতে একটী শান্ত সাধক (১) ছিলেন। তিনি অনেক দিন এই দলে বঙ্গচন্দ্রের উপাসনাতে যোগ দিয়াছেন। অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি যে দুইটী সঙ্গীত গাহিয়াছিলেন নিম্নে তাহাও প্রদত্ত হইতেছে। ইহা হইতে সুধীগণ দেখিতে পাইবেন, ব্রহ্মের অদ্বিতীয় স্বরূপের প্রকাশ কেমন তাঁহাতেও সংক্রামিত হইয়াছিল।

সুর—একতালা।

কর কর মা এবার যা ইচ্ছা তোমার।
লও ফিরে, এ দাসেরে, দিয়ে ছিলে যত উপহার।

যত স্বার্থ, অহঙ্কার, 'আমি আর আমার' সকল ছেড়ে তোমার ঘরে, করিব বিহার ; কেবল 'তুমি', 'তুমি' 'তোমার' বলে, উঠিব কোলে তোমার।

দিয়াছিলে যে আমায়, কামাদি ছয় জনায়, তারা হাড়ে মাংসে জ্বালায়েছে যত প্রাণে চায় ; আমি প্রভু হয়ে তাদের কাছে, চোর ছিলাম মা অনিবার।

আমার পিতৃদত্ত ধন, করিয়ে গ্রহণ, এসেছিলাম ভবের হাটে, হয়ে মহাজন ; এখন লাভে মূলে হাড়াইয়ে শরণ লইলাম তোমার।

দেশ বিদেশে ফিরে, স্বাধীন ব্যবসায় করে, ঝালাপালা হয়েছে প্রাণ, বলিব কারে ; এখন ঘরের ছেলে ঘরে এল, দেমা একবার জয় জোকার।

তোমার শ্রীমুখ হেরিয়ে, মধুর কথা শুনিয়ে, আনন্দে তোমার আজ্ঞা শিরে ধরিয়ে ; সদা সাধিব তোমার কার্য্য, হবে ভাগ্যে যা হবার।

(১)। শ্রদ্ধের ভ্রাতা দীননাথ সেন সরকার

দ্বিতীয় সঙ্গীত। (১)

ঝিঁঝিট—একতালা।

নমামি দেব পূর্ণ ব্রহ্ম, যোগেশ্বর হরি।

সত্যং শিব-সুন্দরং প্রাণ রমণকারী।

এক অদ্বিতীয় তুমি, তুমি আমার তোমার আমি, ভবে তোমা বই, আর কেহ নাই 'আমি আমার করে' মরি।

কত যে সুখ তোমার জ্ঞানে, কি আনন্দ তোমার ধ্যানে; সমাধি যোগ সাধনে পুণ্য, যোগীজন চিতহারী।

৬। পুণ্য স্বরূপের প্রকাশ।

ঈশ্বর পুণ্যময় পবিত্র স্বরূপ, শুদ্ধ অপাপ বিদ্ধ। এ স্বভাব শুধু ঈশ্বরের। এজন্য শ্রীমৎ শঙ্কর বলিলেন, 'তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব।" দেবনন্দন ঈশা বলিলেন, 'আমাকে কেন (Good) উত্তম বলিতেছ? পিতা ভিন্ন আর কেহ উত্তম হইতে পারে না।' অথর্ব্ব বেদে আছে ঃ—

অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভু-
রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনোনঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন ভিভায় মৃত্যো-
রাত্মানং ধীরমমরং যুবানম্॥ অথর্ব্ব ১০।৮।৪৪।

---

(১)। এই সঙ্গীত কোনও সঙ্গীত পুস্তকে নাই। ইহা আমরা ভ্রাতা দীননাথের মুখেই বহুবার শুনিয়াছি, সুতরাং ইহা তাঁহার রচিত, আমরা অনুমান করি।

অর্থ। সেই পরমাত্মা কামনা পরিশূন্য, বিকার বিরহিত অমৃত, স্বয়ম্ভু, নিজ আনন্দে নিজে পরিতৃপ্ত, কিছুতেই ন্যূন নহেন। অধিকারী, অমর, শ্রেষ্ঠ সেই পরমাত্মাকে জানিয়া মনুষ্য আর মৃত্যুকে ভয় করে না।

ঈশোপনিষৎ বলেন :—

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ-
মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভু-
র্যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ ঈশা—৭।

অর্থ। তিনি সর্ব্বব্যাপী, নির্ম্মল, নিরবয়, শিরা ও ব্রণ রহিত, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ; তিনি সর্ব্বদর্শী, মনের নিয়ন্তা, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বপ্রকাশ; তিনি সর্ব্বকালে প্রজাদিগের যথোপযুক্ত অর্থ সকল বিধান করিতেছেন।

ঈশ্বরের পুণ্য স্বরূপ, কিরূপ অজ্ঞাতসারে এবং অলক্ষিত ভাবে, মানব স্বভাবে কার্য্য করে, তাহার একটী অতি সুন্দর এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, মহাভারতে দেখা যায়, যথা :—

দমেন সদৃশং ধর্ম্মং নান্যং লোকেষু শুশ্রুমঃ।
দমো হি পরমো লোকে প্রশস্তঃ সর্ব্বধর্ম্মিণাম্॥
সুখং দান্তঃ প্রস্বপিতি সুখঞ্চ প্রতিবুধ্যতে।
সুখং লোকে বিপর্য্যেতি মনশ্চাস্য প্রসীদতি॥ শা ১৬০.১০।১১।

অর্থ। ইন্দ্রিয়-সংযমের তুল্য পৃথিবীতে আর উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম শুনি নাই, কারণ ইহলোকে সর্ব্বধর্ম্মাক্রান্ত লোকের মধ্যে ইহা শ্রেষ্ঠ ও প্রশস্ত। যাঁহার ইন্দ্রিয় সকল স্বীয় বশবর্ত্তী, তিনি সুখে নিদ্রা যান, সুখে জাগ্রত হন, এবং সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাঁহার মন সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকে।

মানবের অন্তরে পাপবোধ এবং আত্ম-প্রসাদ ঈশ্বরের পুণ্য স্বরূপের প্রকাশে হইয়া থাকে। য়িহুদি ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে ঃ—

Create in me a olean heart, O God, and renew a right spirit within me. Ps. li. 10.

অর্থ। হে পরমেশ্বর আমার হৃদয়কে বিশুদ্ধ কর এবং আমার অন্তরে প্রকৃত ভাব পুনরুদ্দীপিত কর।

Meroy and truth are met together; righteousness and peace have kissed eaoh other. Ps. lxxxv. 10.

অর্থ। সত্য ও করুণা তাঁহাতে (ঈশ্বরে) সম্মিলিত হইয়াছে, পুণ্য ও শান্তি পরস্পরকে চুম্বন করিয়াছে।

পুণ্যময় পরমাত্মার প্রভাবে মানবাত্মা কিরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, তৎ সম্বন্ধে খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে, যথা ঃ—

But the fruits of the Spirit is love, joy, peaoe, long-suffering, gentleness, faith, meekness temperanoe.
Gal. v. 22-23.

অর্থ। প্রেম, আনন্দ, শান্তি, সহিষ্ণুতা, সুকোমল ব্যবহার, কল্যাণ-শীলতা, বিশ্বাস, বিনম্রতা, মিতাচার এই সকল পবিত্রাত্মার ফল।

Every good gift and every perfeot gift is from above, and cometh down from the Father of lights, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Jam. I. 17.

অর্থ। যাহা কিছু উৎকৃষ্ট দান, যাহা কিছু সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর দান, তাহা ঊর্দ্ধ হইতে অবতীর্ণ হয়; সেই জ্যোতির্ম্ময় পিতা হইতে সমাগত হয়; যাঁহাতে কোন পরিবর্ত্তনশীলতা অথবা ছায়ামাত্র অন্যথা ভাব নাই।

মানবের ধর্ম্ম জীবনের প্রকৃত পুরস্কার পুণ্য লাভ, অর্থাৎ পুণ্যময় ঈশ্বরের পবিত্রতা প্রাপ্ত হওয়া। এ সম্বন্ধে ইস্লাম

ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ শরিফে এবং অবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখা যায়, যথা :—

I expect my reward from God alone, and I am commanded to be one of those who are resigned unto him.—কোরাণশরিফ।

অর্থ। আমি কেবল ঈশ্বরের নিকটেই পুরস্কারের প্রত্যাশা করি, এবং তাঁহাতে যাঁহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, আমি তাঁহাদেরই একজন হইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

May we thus attain to that which is so to union with Thy purity to all eternity. Avesta—Yaona. XI. 6.

অর্থ। আমরা যেন এইরূপে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তোমার পবিত্রতার সহিত প্রকৃত যোগ প্রাপ্ত হই।

I praise and exalt (thee) the Creator Ormazd, the brilliant, Majestic, Omniscient, the Perfector of deeds, the Lord of Lords, the Prince over all princes, the Protector, the Creator of the created, the Giver of daily food, Powerful, Good, Strong, Old, Forgiving, Granter of forgiveness, Rich in Love, Mighty and wise, the *pure* Supporter—Do, Khorda—7.

অর্থ। হে স্রষ্টা অরমজ্‌দ, আমি তোমার যশ কীর্ত্তন করি এবং তোমাকে মহীয়ান্‌ করি। তুমি উজ্জ্বল, ঐশ্বর্য্যশালী, সর্ব্বজ্ঞ, তুমি সকল কার্য্যের পূরক, প্রভুর প্রভু, রাজাধিরাজ, রক্ষক, সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টা, দৈনিক আহার প্রদাতা, ক্ষমতাবান্‌, মঙ্গলময়, শক্তিমান্‌, পুরাণ, ক্ষমাবান্‌, ক্ষমাপ্রদাতা, প্রেমপূর্ণ, প্রভাবশালী, এবং জ্ঞানবান্‌, ও পবিত্র প্রতিপালক।

ঈশ্বরের পুণ্য-স্বরূপ সম্বন্ধে আমরা উল্লিখিত শাস্ত্র-বাক্য হইতে বুঝিতে পারি যে, সর্ব্বকালে এবং সর্ব্বদেশে সমুদায় নরনারীর অন্তরে তাঁহার পুণ্য স্বরূপের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার উপাসনাতে, নাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ও মননে সেই ভাব উদ্দীপ্ত হয়। আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রে যখন সেই পুণ্য স্বরূপ, বিশেষভাবে উদ্দীপিত হইল, সেই ভাবের প্রার্থনানুসারে তখন এই সঙ্গীত হইল, যথা ঃ—

ভৈরবী—আড়া।

হরি তব রূপ পুণ্য, শান্তিই তব লাবণ্য।
পুণ্য শান্তির আধার, কে আছে আর তোমা ভিন্ন।
পুত্রের রূপ বাধ্যতা, লাবণ্য তার একতা,
বুঝাইলে এই কথা, পাপীরে হয়ে প্রসন্ন।
তব পুত্রের চরিত, হউক জীবনের শোণিত,
সেবিয়ে তোমার পদ, জনম হইবে ধন্য।
বাধ্যতা আত্মার বল, একতা পানীয় জল,
এই অন্ন-জল বিনা, বাঁচে না আত্মার প্রাণ।

সাম্বৎসরিক উৎসবারম্ভে একটী আরতির গানেও পুণ্য স্বরূপের বিশেষ প্রকাশ দেখা যায় যথা ঃ—

আরতি—ঠুমরী।

প্রণাম করি মা তব চরণে।
প্রীতি বিকশিত মনে।

ও মা দীন-জননী, স্নেহ-প্রেম-রূপিণী,
মোরা ধন্য হব, আজি তব গুণ কীর্ত্তনে।

* * * * * *
* * * * * *

ও মা সত্য রূপিণী, বেদবাক্য-বাদিনী, (আছ) সরস্বতী রূপে তুমি বিজ্ঞান দর্শনে; জ্ঞান-সভ্যতা বিস্তার করিতেছ অনিবার, নয়ন তারা হয়ে আছ অন্ধ নয়নে।

ও মা ভক্ত বৎসলে, তোমার কোমল কোলে, কত দেব দেবী পুত্র কন্যা আনন্দে দোলে; প্রেমে এলাইয়ে কেশ, ধরি উন্মাদিনী বেশ, সতত নিরত আছ সন্তান পালনে।

তোমার পুণ্যময় রূপ, আহা! কিবা অপরূপ, হয় পাতকী পবিত্র তব দরশনে, একে পুণ্যের কিরণ, তাহে শান্তির মিলন, (রূপে) তাইতো মোহিত নর অমরগণে।

৭। আনন্দ স্বরূপের প্রকাশ।

আমাদের ধর্ম্ম পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আনন্দময়ের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া বলিলেন "পরিপূর্ণমানন্দম্"। বৃহদারণ্যকোপনিষদে আছে:—

সলিল একো দ্রষ্টা দ্বৈতো ভবত্যেষ ব্রহ্মলোকঃ সম্রাড়িতি হৈনমনুশশাস যাজ্ঞবল্ক্যঃ। এষাস্য পরমা গতিরেষাস্য পরমা সম্পদেষোহস্য পরমো লোক এষোহস্য পরম আনন্দঃ। এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি। বৃহ,—৬।৩।৩২।

অর্থ। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য রাজর্ষি জনককে এই উপদেশ দিলেন, হে রাজন্, সলিলবৎ স্বচ্ছ সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরই ব্রহ্মলোক

ইনিই ইহার পরম গতি, ইনিই ইহার পরম সম্পদ্, ইনিই ইহার পরম লোক, ইনিই ইহার পরম আনন্দ। এই আনন্দ-স্বরূপ পরমেশ্বরের কণামাত্র আনন্দ অপরাপর সমুদায় জীব উপভোগ করিতেছে।

আর্য্য ঋষিগণ আরও বলিলেন—"যদি আনন্দং ন স্যাৎ,কো বা প্রাণ্যাৎ কো বা অন্যাৎ। অর্থাৎ আনন্দ না পাইলে, কে বা জীবন-ধারণ করিত, কে বা চেষ্টা করিত?" ইহা হইতে অনায়াসেই পরিগ্রহ করা যায়, যে, 'আনন্দই' জীবন ধারণের এবং যাবতীয় অনুষ্ঠানের মূল। এই আনন্দই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। ঈশ্বর পূর্ণ আনন্দময়, অতএব তাঁহার সহিত প্রেম-যোগে যুক্ত হইলেই জীবের পূর্ণ পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। ভক্তগণ এই আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করেন এবং আর আর যাহা কিছু সমুদায় একেবারে ভুলিয়া যান।

এই আনন্দ প্রাপ্তি সম্বন্ধে, য়িহুদি শাস্ত্রে দেখা যায়ঃ—

One thing have I desired of the Lord, that will I seek after; that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life, to behold the beauty of the Lord, and to enquire in the temple.—Ps. xxvii. 4.

অর্থ। ঈশ্বরের নিকট আমার এই একটী মাত্র ভিক্ষা, এবং তাঁহারই জন্য আমি চেষ্টা করিব, যেন পরমেশ্বরের আলয়ে যাবজ্জীবন বাস করিয়া আমি তাঁহার সৌন্দর্য্য দর্শন করি, এবং তাঁহার মন্দিরে তাঁহাকে অনুসন্ধান করি।

Although the fig tree shall not blossom. neither shall fruit be in the vines: the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no meat; the flook shall

be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls; yet I will rejoice in the Lord, I will gloy in the God of my salvation.—Hab. iii; 17. 18.

অর্থ। যদিও ডুম্বুর বৃক্ষ মুকুলিত না হয়, এবং দ্রাক্ষালতা ফলশূন্য হয়, জম্বীর বৃক্ষের কর্ষণ বিফল হয়, এবং ক্ষেত্র হইতে আহার্য্য সামগ্রী উৎপন্ন না হয়, মেষাদির যূথ বাসস্থান হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং পশুশালা পশুশূন্য হয়, তথাপি আমি ঈশ্বরেতে আনন্দ করিব; আমার পরিত্রাণ-দাতা ঈশ্বরেতে আমি আহ্লাদ করিব।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্র বলেন ঃ—

For the kingdom of God is not meat and drink; but righteousness, and peace, and joy in the Holy Ghost.—Rom. xiv. 17.

অর্থ। ঈশ্বরের রাজ্য, পান ভোজন নহে, কিন্তু পুণ্য, শান্তি ও পবিত্রাত্মাতে আনন্দ।

Rejoice in the Lord always: and again I say Rejoice.—Phil—iv. 4.

অর্থ। সর্ব্বদা ঈশ্বরেতে আনন্দিত হও, আমি পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বরেতে অনন্দিত হও।

আচার্য্য কেশবচন্দ্র ধর্ম্ম জীবনের প্রথমেই 'ব্রহ্মানন্দ' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এ ব্যাপার যে ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপের প্রকাশেই তাঁহার জীবনে ঘটিয়াছিল তাহা বলা বাহুল্য। আমরা বঙ্গ চন্দ্রের জীবনেও দেখিতে পাই, তাঁহার ধর্ম্ম জীবনের আরম্ভেই তিনি পরম সুন্দর ভুবনমোহনের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত ও আকৃষ্ট

হইয়াছিলেন। তৎকালের ভাব এইরূপে সঙ্গীতাকারে আছে, যথা :—

খাম্বাজ। ঠুমরী।

অপরূপ রূপ ধারী—(আহা রে)।
পবিত্রাত্মা রূপে দেখ এসেছেন হরি।

সত্যেতে গঠিত কায়, জ্ঞান-জ্যোতি শোভে তায়, অখণ্ড মণ্ডলাকার সীমা নাহি হেরি।

সুকোমল বক্ষঃস্থলে, প্রেমের লহরী খেলে, ভক্তবৃন্দ লয়ে কোলে আছেন বিশ্বেশ্বরী।

অখণ্ড প্রতাপ তাঁর, করিতেছে নমস্কার, তেত্রিশ কোটি দেবতা পদতলে পড়ি।

পুণ্য-তেজ নিরুপম, শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্, (যাঁর) দরশনে, পাপী জনে তরে ভব-বারি।

ত্রিভুবন বিমোহন, সচ্চিদানন্দঘন, জগত মোহিত করে, বাজায়ে বাঁশরি।

দেখে সুন্দর মূরতি, উঠে প্রগল্ভা ভকতি, তাই প্রেমানন্দে জীব বলে হরি হরি।

যে দেখে রূপ হয় মোহিত, গায় হরি-গুণ-গীত, রাজদণ্ডধারী হয় ত্রিদণ্ডধারী, (হয় প্রেমের ভিখারী)।

আদরে এই দেবতারে লও ঘরে বরি।

এই ভুবনমোহনের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বঙ্গচন্দ্র জীবনের কার্য্য আরম্ভ করিলে, সেই ভাব ক্রমে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। তদবস্থা এই ভাবে সঙ্গীতাকারে আছে। যথা :—

নগর সংকীর্ত্তন।

আহা কি সুন্দর, হরি রূপ বিমোহন রে।

করে যাঁর রূপেতে জগত আলো, পাপ তাপ মোচন রে, করে প্রাণ মন হরণ রে।

প্রকৃতির বক্ষে বসি, রসরাজ হরি রে, প্রেমানন্দে করেন সদা, প্রেম রস পান রে।

জড়-পশু-নর প্রকৃতি, হরি পতির সতী রে; এক হরি তিন প্রকৃতিতে ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা রে।

ত্রিবিধ প্রকৃতি সহ, হৃদয়ে বসায়ে রে; পূজিব, শ্রীহরি ধনে, প্রীতি-ফুল-চন্দনে রে।

পতি রূপে হরি পদে প্রীতি দান করিলে রে, নববিধানের স্রোতে জীবন ভাসিবে রে।

এ নব বিধানে সিদ্ধি, শিশু হয়ে যাওয়া রে, মাতৃ বক্ষে মাথা রেখে, সুখ-মোক্ষ পাওয়া রে।

এই যে নববিধানে সিদ্ধি 'শিশু হয়ে যাওয়া', ইহা আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ লাভ করিয়াছিলেন। তাহার একটু আভাস প্রেম-দাসের সঙ্গীতে পাওয়া যায়। যথা:—

কালহ্যাংড়া—একতালা।

তোর কোলে লুকায়ে থাকি। (মা)
চেয়ে তব মুখ পানে, মা মা মা বলে ডাকি।

দেখে শুনে ভয় করে প্রাণ কেঁপে উঠে ডরে; রাখ আমায় বুকে করে, স্নেহের অঞ্চলে ঢাকি।

ডুবে চিদানন্দ রসে, মহাযোগ নিদ্রাবশে, দেখি ওরূপ অনিমিষে, নয়নে নয়ন রাখি।

শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র পার্থিব জীবনের শেষ ভাগে আনন্দময়ীর সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা এইভাবে সঙ্গীতাকারে আছে। যথা :—

রামপ্রসাদী সুর। একতালা।

মা বলে তোমায় ডাকিব।
আর প্রসন্ন মুখ দেখিব।

মা গো, তোমার কোমল কোলে, আছেন যত শিশু ছেলে; আমরাও তাঁদের সঙ্গে মিলে স্তন্য-সুধা পান করিব।

মা গো, তোমার অন্তঃপুরে, ভক্তেরা বসতি করে; সঙ্গোপনে তাঁদের সনে, অমৃত কথা শুনিব।

পেয়ে তোমার অভয় পদ, হব সবে নিরাপদ; ভক্তি রসে গদ গদ, হয়ে তোমার গুণ গাইব।

মা গো, তুমি হেসে হেসে, ডুবাইবে প্রত্যাদেশে তোমার আদেশ উপদেশে, চির শুদ্ধ সুখী হব।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরি ওঁ।

সম্পূর্ণ

পরিশিষ্ট। (ক)

অনুসরণ।

শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র সম্বন্ধে আচার্য্য কেশবচন্দ্র লিখিলেন—"অনুসরণ এবং পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ভাব সংস্থাপন।" এই 'অনুসরণ' কিরূপ এবং 'পূর্ব্ববঙ্গে নববিধানের ভাব সংস্থাপনের' ব্যাপারই বা কি ? উপসংহারে আমরা তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা যাহা দেখিয়াছি, যাহা জানিয়াছি এবং যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে সহজে এই মীমাংসা করা যায় যে, তিনি দেব-নন্দন শ্রীঈশার অনুসরণ করিয়াছেন এবং ঈশার ন্যায় স্বর্গরাজ্য বিস্তারের জন্যই জীবন ধারণ করিয়াছেন। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রও কেশবচন্দ্রের অনুসরণে নববিধানের ভাব (Spirit) পূর্ব্ববঙ্গে সংস্থাপনের জন্য যত্ন করিলেন।

কেশবচন্দ্র যে ঈশার অনুসরণ করিলেন, তাহা, তিনি আপনাকে 'যীশুদাস' বলাতেই সপ্রমাণিত হইয়াছে। তথাপি আমরা পাঠকের নিকট, কেশবচন্দ্রের আরও পরিষ্কার উক্তি-সকল প্রদর্শন করিয়া, তাহা এখানে দৃঢ়ীভূত করিতেছি।

কেশবচন্দ্র তাঁহার The New Dispensation—নববিধান পত্রিকাতে এক প্রবন্ধে লিখিলেন ঃ—

খ্রীষ্ট এবং কেশবচন্দ্র সেন।

যীশুখ্রীষ্ট পৃথিবীতে, পাপীর পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছিলেন ; তাঁহার অপর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কেশবচন্দ্রও ব্যগ্র যে পৃথিবী, ভ্রান্তি ও পাপ

হইতে মুক্ত হয় এবং পুণ্যে নবজীবন লাভ করে। মানব জাতির সামাজিক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি উদ্দেশ্য করিয়া, খ্রীষ্ট স্বর্গরাজ্যের শিক্ষা দিলেন। কেশবচন্দ্রও দীন ভাবে এবং প্রার্থনা পূর্ণ অন্তরে, সেই পবিত্র স্বর্গরাজ্য ভারতে সংস্থাপন করিতে যত্নবান্। খ্রীষ্ট, পূর্ণ-আত্মত্যাগ এবং পূর্ণ-বৈরাগ্য চাহিলেন। কেশবও, যাহাতে মানবগণ সংসারাসক্তি ও ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা পরিত্যাগ করে, এবং কল্যকার জন্য কোন চিন্তা না করে, তজ্জন্য চেষ্টা করেন। খ্রীষ্ট, ক্ষমা-ধর্ম্মের উপরে বিশেষ জোর দিলেন এবং প্রেমের মহোচ্চ ধর্ম্মমত শিক্ষা দিয়া শত্রুকেও ভালবাসিতে বলিলেন। কেশবও সেই সর্ব্বোচ্চ নীতি আপনার দেশবাসীকে শিক্ষা দিতেছেন। খ্রীষ্ট বলিলেন, জলাভিষেক আত্মিক পবিত্রতা সাধনের, এবং রুটি-ভোজন অধ্যাত্মভাবে ঐশ্বরিক জীবনে একাত্মতা লাভের, নিদর্শন। কেশবও হিন্দুদিগকে এইরূপই বলেন। 'ঈশ্বরকে ভালবাস এবং তোমার প্রতিবাসীকে ভালবাস'; এতদ্ভিন্ন খ্রীষ্টের অন্য কোন ধর্ম্মমত ছিল না। কেশবও অপর কোন ধর্ম্মমত স্বীকার করেন না, এবং সর্ব্বদা এই সরল এবং সুস্পষ্ট তত্ত্ব শিক্ষাদেন। খ্রীষ্ট, পূর্ণ সত্য ঘোষণা করিলেন না, কিন্তু মানব সন্তানকে সমগ্র সত্যে লইয়া যাইবার ভার পবিত্রাত্মার উপর রাখিলেন। কেশবও স্বীকার করেন, সকলের শ্রেষ্ঠ পবিত্রাত্মা যিনি জীবন্ত গুরুরূপে সমগ্র সত্য শিক্ষা দেন এবং খ্রীষ্টের শিক্ষার অতিরিক্ত শিক্ষাদান ও পূর্ণতা-সম্পাদন করেন। খ্রীষ্টের শিক্ষানুসারে, পাপের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই কেবল পরিত্রাণ নহে, কিন্তু ঐশ্বরিক স্বভাব-লাভ করা। এবং কেশবও যাহা সর্ব্বোচ্চ মুক্তি বলিয়া শিক্ষা দেন, তাহা ঈশ্বরের সহিত মানবাত্মার অনন্ত কালের যোগ ভিন্ন আর কি? খ্রীষ্ট বলিলেন 'তোমরা, তোমাদের স্বর্গস্থ পিতা যেরূপ পূর্ণ, সেইরূপ পূর্ণ হও; এবং এতদ্ব্যতীত মনুষ্য, স্বীয় জীবনের জন্য অপর কোন নিম্নতর উদ্দেশ্য রাখে, ইহা তিনি ইচ্ছা করিলেন না।

কেশবের ধর্ম্ম-শিক্ষাও, পার্থিব সর্ব্ব প্রকারের নীচ উৎকর্ষ, সাধনকে তুচ্ছ করে এবং সর্ব্বপ্রকারের বিমিশ্রভাব ও আংশিক উন্নতিকে হেয় বলে। খ্রীষ্ট ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার জীবনের ঈশ্বর-নিয়োজিত-কার্য্য, বিনাশ করা নহে, কিন্তু পুরাতন বিধানকে কার্য্যে পরিণত করা এবং তাহার পূর্ণতা সাধন করা। কেশবও সেইরূপ, ঈশ্বরের পুরাতন বিধানসমূহের শত্রু বা বিনাশক নহেন, কিন্তু একজন বন্ধু, যিনি ঐ সকলের পূর্ণতা সাধন করিতে এবং তাঁহাদের ন্যায়ানুগত চরম উদ্দেশ্য সংসাধন করিতে ইচ্ছুক। অমিতব্যয়ী পুত্রের গল্পদ্বারা, খ্রীষ্ট, জঘন্য পাপীর সম্বন্ধেও, বিশ্বাস, আশা এবং স্বর্গ শিক্ষা দিলেন। কেশবেরও বিনা এই গল্প—যাহা সমুদায় ধর্ম্ম শাস্ত্রের সার—অন্য কোন সুসংবাদ প্রচার করিবার নাই। খ্রীষ্ট, আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিলেন এবং ঘোষণা করিলেন, পবিত্র পিতা ঈশ্বরের সহিত পাপী জগতের পুনর্ম্মিলনের জন্য আপনি নিত্যকালের সার্ব্বজনীন প্রায়শ্চিত্ত। কেশবও সম্পূর্ণরূপে খ্রীষ্টের পুত্রত্বে বিশ্বাস করেন। তাঁহার ভিতর দিয়া পিতা ঈশ্বরের সহিত যে পাপীর পুনর্মিলন, তাহা স্বীকার করেন, এবং এই সত্যের সাক্ষ্য দান করেন। খ্রীষ্ট বলিলেন 'আমিই পথ'। কেশব বলেন, হাঁ তুমিই পথ, হে যীশু।' খ্রীষ্ট বলেন—'আমি ধর্ম্ম জীবনের অন্ন, আমার শিষ্য আমাকে অন্নরূপে আহার করিবে, যেন আমি তাহার মাংসের মাংস এবং রক্তের রক্ত হইতে পারি।' আর প্রভু যীশুর অনুগত শিষ্য কেশব, যীশু খ্রীষ্টে জীবন ধারণ করেন, তাঁহার সামর্থ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হন এবং তাঁহার আনন্দে আনন্দিত হন এবং সত্য সত্যই বিশ্বাসের ভিতর দিয়া, কেশবের মাংস খ্রীষ্টের মাংস, এবং কেশবের রক্ত খ্রীষ্টের রক্ত হইয়াছে। খ্রীষ্ট বলিলেন—আমার শিষ্যগণ এবং ভৃত্যবর্গ যেখানে আমিও সর্ব্বদা সেখানে, এবং আমিও যেখানে আছি, তাহারাও সেখানে আসিবে। অতএব যেখানে যীশুদাস কেশব আছেন, সেখানে

পবিত্র যীশু আছেন, এবং যেখানে যীশু আছেন সেখানে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য যীশুদাস আছেন এবং চিরকাল থাকিবেন। যীশু দীনাত্মা পাপীকে প্রীতি করেন, তাহার পাপ যন্ত্রণায় সমবেদনা অনুভব করেন, তাহাকে পুনরায় নব জন্ম দান করেন ও তাহাতে বাস করেন, এবং পাপীও তাঁহাতে স্থিতি করে, ও তাঁহারা উভয়ে একত্র পিতাতে বাস করেন। এইরূপ যীশুদাসে যীশু, ও যীশুতে যীশুদাস নিগূঢ় যোগে পরস্পর পরস্পরে সম্মিলিত ভাবে বাস করিতেছেন এবং তাঁহারা উভয়ে—সুন্দর প্রভু (যীশু) ও তাঁহার পাপীষ্ঠ দাস—পিতা পরমেশ্বরে এক। দাস সেন বলেন—আমি সুখী, সুখী, সুখী, বার-ত্রয় বলিতেছি আমার প্রভু যীশুতে আমি ধন্য হইতেছি।—অনুবাদ—The New Dispensation. Vol. II.

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র দেবনন্দন ঈশার বিশ্বাস পৃথিবীকে দেখাইয়া গেলেন। তাহাতেই কেশবচন্দ্র বলিলেন, নববিধান খ্রীষ্টের দ্বিতীয় সমাগম। কেন না যীশু খ্রীষ্টের যে মহোচ্চ আদর্শ ছিল, কেশবও সেই আদর্শই ধরিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্রের উল্লিখিত উক্তি হইতে সুধীগণ তাহা পরিষ্কার বুঝিতে পারিয়াছেন। বিশ্বাসের একতাই প্রকৃত একতা। বিশ্বাসেই কেশবচন্দ্র ঈশার সহিত এক হইলেন এবং পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য বিস্তারের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। এই পূর্ব্ববাঙ্গলার রাজধানী ঢাকা নগরে বাস করিয়া, বিশ্বাসের একতা যোগেই শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র আচার্য্য ব্রহ্মানন্দের অনুসরণ করিয়া নববিধানের ভাব (spirit) স্থাপনে যত্ন করিলেন।

মানবের অন্তরে প্রথমতঃ চিন্তা, তৎপর ভাব, এবং তৎপর ভাব হইতে জীবনে কার্য্য হইয়া থাকে। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের

অনুসরণ করিয়া ধর্ম্ম জীবনে চলিতে হইবে, এই চিন্তা যখন তাঁহার অন্তরের ভাবে পরিণত হইল, তখন হইতে বঙ্গচন্দ্রের জীবনে কার্য্যও আরম্ভ হইল। সে কার্য্যগুলি এই, যথা :—

(১) সঙ্গত সভার আলোচনা।

(২) বক্তৃতাদি দ্বারা ধর্ম্মপ্রচার।

(৩) সমবেত ভাবে সমবিশ্বাসীদিগকে লইয়া দৈনিক উপাসনা।

(৪) নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলে যাহাতে ব্রহ্মানন্দ-রস আস্বাদন করিতে পারেন তজ্জন্য আশ্রম সংস্থাপন।

(৫) নারী জাতির শিক্ষার চেষ্টা।

(৬) মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ দ্বারা সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক উন্নতি সাধন।

(৭) পূর্ব্ববাঙ্গলাতে প্রেমভক্তি বিস্তারের জন্য একটী দাস-মণ্ডলী স্থাপন।

(৮) উন্নত গৃহস্থগণের একটী পল্লী স্থাপন।

(৯) জীবন্ত ঈশ্বরের উপাসনা মন্দির প্রতিষ্ঠা।

আমরা বলিয়াছি মানুষের অন্তরে প্রথমে চিন্তা। এই চিন্তা, শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রে তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই জাগিয়া উঠিয়াছিল। Young Bengal This is for you.—'হে বঙ্গীয় যুবক ইহা তোমারই জন্য', এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা যখন শ্রীমৎ কেশবচন্দ্র প্রকাশ করেন, তৎকালে বঙ্গচন্দ্র ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতেন। ইহা পাঠ করিয়া তিনি এত উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে, অভিভাবক, স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া আপনি মুক্তকণ্ঠে উহা পাঠ করিয়া তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন!

ইহা হইতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন যে শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের জীবনে কেশবের অনুসরণে কার্য্য-স্রোত, বহু বৎসর পরে আরম্ভ হইলেও, মনে তাঁহার ভাবানুযায়ী চিন্তার উৎস, কত পূর্ব্বে উৎসারিত হইয়াছিল।

যাহা হউক, আমরা শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের কার্য্যোদ্যম ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলিব না, শুধু বিশ্বাসের অনুসরণই আলোচনা করিব। আমরা বলিয়াছি বিশ্বাসের একতাই মানবের প্রকৃত একতা। ঈশার দ্বাদশ শিষ্য মধ্যে জুডাস্ ও একজন ছিলেন। কিন্তু ঈশার সহিত তাঁহার বিশ্বাসের একতা না থাকাতেই তিনি ঈশাকে ছাড়িলেন, এবং তাঁহাকে শত্রু হস্তে অর্পণ করিলেন। ইহা স্মরণ করিয়া চিরঞ্জীব শর্ম্মা 'বিধান ভারতে' লিখিলেন—

"কত জুডা গুরুত্যাগী এ নববিধানে।"

চিরঞ্জীবের এই উক্তি তিরস্কার বলিলে চলিবে না। কেননা বিশ্বাসের একতা রক্ষা করিয়া, তাহাতে পরিবর্দ্ধিত হওয়া যে একটী অতি গুরুতর ব্যাপার, তাহা স্মরণ করিয়াই, এমন কেশবচন্দ্রও আপনাকে জুডাস্ বলিতে কিছুমাত্র কুন্ঠিত হইলেন না। প্রতি মানবে বিশ্বাস আছে এবং প্রতি মানবই ঈশ্বর-পিপাসু। তথাপি মোহাসক্ত হইয়া মানুষ বিভ্রান্ত হয়। এ কথা ব্রাহ্ম সমাজে নূতন নহে। কেননা, মহর্ষির ভাবে শ্রদ্ধেয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর গাহিলেন—

'আমি হে তব কৃপার ভিখারী। সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে, কুসুম করে গন্ধ দান, মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।'

কিন্তু বঙ্গচন্দ্র শ্রীমৎ কেশবচন্দ্রের অনুসরণে পূর্ব্ববঙ্গে একটী বিশ্বাসী দল গঠন করিতে সংকল্প করিয়া তাবৎ পরীক্ষা ও প্রলোভনের মধ্যে, কেশবচন্দ্রের সহিত সংযুক্ত রহিলেন। এই বিশুদ্ধ যোগ জীবন্ত ঈশ্বরে সংস্থাপিত হওয়াতেই, বঙ্গচন্দ্র পরীক্ষাতে অটল ছিলেন। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের আরাধনা ও প্রার্থনাতে আমরা সর্ব্বদাই এই যোগের পরিচয় পাইয়াছি। শ্রীশ্রীভগবানে কেশব-চন্দ্রের সহিত তাঁহার সেই যোগ যাহাতে গভীর এবং ঘনীভূত হয় তজ্জন্য বঙ্গচন্দ্র যে প্রার্থনা করিলেন তাহা এই ভাবে সঙ্গীতাকারে লিপিবদ্ধ আছে ; যথা ঃ—

ভৈরো—একতালা।

সেই পূর্ণ বিশ্বাসে বিশ্বাসী করিয়ে দাস করে রাখ চরণে।
যে বিশ্বাস বৈরাগ্য, বিশুদ্ধ বিবেক, দেখালে কেশব জীবনে।
কেশব বিশ্বাসে হয়ে চক্ষুষ্মান্, দেখি হে তোমারে সদা বর্ত্তমান, (হয়ে) সেই বিবেকে ধনী,তোমার কথা শুনি, সাজি সেই বৈরাগ্য বসনে।
(আমার) বিশ্বাসের নিশ্বাস বহে কিনা বয়, তাই তুমি দেখ ওহে দয়াময়, শোণিতের মত, তোমার আনুগত্য বহে কিনা বহে জীবনে। (দেখ)।

আমরা শুনিয়াছি, ব্রহ্মানন্দের সহযোগিগণ জীবনের প্রত্যূষে ব্রহ্মদর্শনের জন্য ব্যাকুল হইলে, তিনি, তাঁহাদিগকে ব্রহ্মদর্শন শিক্ষার জন্য মহর্ষির নিকট যাইতে বলেন। তাঁহারা মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের নিকট গিয়া. ব্রহ্মদর্শনের আগ্রহ প্রকাশ করিলে. তিনি বলিলেন—'ব্রহ্ম দর্শন না করিলে কি ব্রাহ্ম হওয়া যায় ? তবে যাঁহারা ব্রহ্মদর্শনের জন্য ইচ্ছুক তাঁহারাও ব্রাহ্ম।' মহর্ষির এই

উক্তি অধ্যাত্মরাজ্যের একটী সুগভীর তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে। যাহার বিশ্বাস, বৈরাগ্য, জ্ঞান, প্রেম অথবা পুণ্যের অভাব আছে, অথবা যে ব্রহ্মদর্শন ও ব্রহ্মবাণী শ্রবণ করিতে ইচ্ছুক, সে যদি ইচ্ছা পূর্ব্বক সে জন্য **প্রার্থনা** করে, তবে তাহা প্রাপ্ত হয়। অতএব 'সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা' কেন না ইহা অধ্যাত্ম সম্পদ লাভের উপায়। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র যে ব্রহ্মানন্দের, বিশ্বাস, বৈরাগ্য ও বিবেক প্রার্থনা করিলেন, তাহা উল্লিখিত সঙ্গীতে প্রকাশিত আছে। আমরা নিম্নে প্রদত্ত সঙ্গীতে দেখিতে পাইব, শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র বিশ্বাসের জন্য কত গভীর ভাবে ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কীর্ত্তন—খয়রা।

(চিদানন্দ সিন্ধুনীরে—সুরে)

আর কিছু ধন চাই না, মা গো, বিশ্বাস দিয়ে বাঁচাও সবে।
তোমাতে বিশ্বাসী হইলেই, মানব জনম সফল হবে।
যীশু এবং ভক্ত যীশুদাসের মত, দেখিব তোমাকে সমক্ষে সতত ;
আস্পর্দ্ধা এমন করি না কখন, বিশ্বাস পেলেই আশা পূর্ণ হবে।
যীশু পেতেন তোমার যেই দরশন, আমাদের ভাগ্যে হবে কি তেমন ;
যীশুদাসের মত পূর্ণ বিকসিত, আমাদের মাঝে আর কে হবে ?
যখন যে বস্তু দেখি মা নয়নে, তাতেই তুমি আছ এইটী নিশ্চয় জেনে ;
পিতা মাতা জায়া, মা তোমার ছায়া, এই বিশ্বাসটী যেন হয় গো ভবে।
নব বিধান বৃক্ষে হউক নব ফল, নবভাবে দাঁড়াক এ বিশ্বাসী দল ;
সুখে দুখে রোগে শোকেও কেবল তোমাকেই স্বীকার করিবে।

দ্বিতীয় সঙ্গীত।

ইংরেজী সুর—একতালা।

পূর্ণ বিশ্বাস দেও পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
কাতরে করি মিনতি ধরি তব শ্রীচরণ।

পূর্ণব্রহ্ম তুমি, বিশ্বাসেতে পূর্ণ আমি, না হলে তোমার সনে, কেমনে হবে মিলন।

তোমাতে বিশ্বাসী যারা, তোমার লোক বলে তাঁরা, চিহ্নিত হয়েছেন, পাইয়াছেন অমর জীবন।

স্বর্গের দেব দেবী যত, বিশ্বাসে সবাই জীবিত; এই চিহ্নে সবাই চিহ্নিত, যত সাধু মহাজন।

বিশ্বাসেতে জেগে থাকি, তব পদে মাথা রাখি; জপি সদা মহামন্ত্র তব ইচ্ছা হোক পূরণ।

সুধীগণ দেখিবেন ঈশা বলিলেন, 'বিশ্বাস একমাত্র প্রয়োজনীয় বস্তু,' ব্রহ্মানন্দ বলিলেন 'বিশ্বাস ঈশ্বরকে দেখে এবং মানবের অমরত্ব দেখে,' আর শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র বলিলেন—'আর কিছু ধন চাইনা, মা গো, বিশ্বাস দিয়ে বাঁচাও সবে।' সুধীগণ আরও দেখিতে পাইবেন, শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র বিশ্বাসের জন্য যে এত ব্যাকুল হইলেন তাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শ্রবণের ফল। আমরা ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের আলোচনা কালে একটী সঙ্গীতে পাইয়াছি, ঈশ্বর বলিতেছেন, 'বিশ্বাসী বিহনে ভবে কে আছে আমার? কেবল বিশ্বাসী রেখেছে নাম জগতে আমার।' ইত্যাদি। এই প্রত্যাদেশের ফলেই বঙ্গচন্দ্র বিশ্বাসের জন্য এত ব্যাকুল হইলেন। এই প্রত্যাদেশের

ফলস্বরূপ শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের যে সকল প্রার্থনা হইয়াছিল তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত এখানে প্রদর্শন করা যাইতেছে, যথা ঃ—

নগর কীর্ত্তন—একতালা।

(১৮১০ শক ৩১শে ভাদ্র)

ধন্য ধন্য ধন্য, পরম চৈতন্য, পুরুষ প্রধান শ্রীহরি।

প্রণমি চরণে, ভক্তবৃন্দ সনে, অবতীর্ণ রূপ নেহারি।

সুর-নর-গতি, হরি-হর-মূরতি, একাধারে পিতা মাতা পতি-সতী, আসিলে জগতে, পদছায়া দিতে, লীলারসময়-রূপ ধরি।

অন্য সুরে।

যদি নববিধান, হে ভগবান্ করিলে আপনি।

তবে ভক্ত-কণ্ঠে কণ্ঠদিয়ে কর হরি-ধ্বনি। (শুনে তরে যাব, হরি মুখে হরি নাম শুনিয়ে তরে যাব ; এই ভবের যাতনা সহজে এড়াব)।

জড়েতে বিশ্বাস, ইন্দ্রিয় বিলাস,
অহঙ্কার পতন মূল ;
এই ত্রিতাপ অনলে, জীব হিয়া জ্বলে,
দেখিতে না পায় কূল। (ভব সাগরে)

তোমায় সত্য বলে সব রসনা, কিন্তু হৃদয় তো সত্য বলে না, কি যাতনা ; মরি হায়! কি জীবের বিড়ম্বনা, তোমায় দেখে শুনে ধরেও বলে পেলেম না—কি যাতনা (অবিশ্বাসী হয়ে, অহঙ্কারী হয়ে, জড়বাদী হয়ে)।

বিশ্বাস-বাধ্যতা, স্বর্গের দেবতা,
প্রকৃত ব্রহ্ম সন্তান ;
তোমায় করিয়ে বিশ্বাস, হয়ে চিরদাস,
পদতলে লভে স্থান। (চিরদিনের তরে)।

(শেষাংশ বিধান সঙ্গীতে দ্রষ্টব্য।)

এইরূপ অনুষ্ঠানে এবং প্রার্থনাযোগে যখন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রে বিশ্বাস ঘনীভূত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হইল, তখন তিনি দেখিলেন পূর্ণব্রহ্ম ভগবান্ কেমন আনন্দময়ী মা রূপে এই ধরাতলে নববিধানে অবতীর্ণ। তাঁহার সেই ভাবের প্রার্থনা সঙ্গীতাকারে এইভাবে আছে, যথা ঃ—

কীর্ত্তন—একতালা।

ঐ দেখ আনন্দময়ী এলেন ধরাতলে রে। (১)

মায়ের প্রেম ক্রোড়ে, প্রিয় শিশু কেমন হাসে খেলে রে।

দেখিলে এরূপ মায়ের জুড়ায় নয়ন মন রে; প্রেমরসে হৃদয় ভাসে, মানুষ হয় দেবতা রে।

পুণ্যময় চরিত্র মায়ের, রসময় ভাব রে, পুত্র মুখে প্রতিভাত, কর দরশন রে।

আদরে এ পুত্রবরে, বক্ষে যে ধরিবে রে, বিনা মূলে মায়ের চরণ, সেই জন পাবে রে।

সংসার অমর ভবন, মায়ের যুগল স্তন রে; (এস) সবে মিলে মায়ের কোলে, করি সুধা পান রে।

উল্লিখিত প্রার্থনা-মূলক সঙ্গীত হইতে সুধীগণ দেখিবেন, শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র কেমন ব্রহ্মমাতার কোলে শিশু রূপে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে দর্শন করিয়া আপনিও সেই শিশুত্ব প্রার্থনা করিলেন

(১) ১৮৮৩ খৃঃ অব্দের শেষ ভাগে দৈনিক প্রার্থনার পর এই সঙ্গীত হয়। এ সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্র অত্যন্ত রুগ্ন। এখানে শিশু ও পুত্র—কেশবচন্দ্র।

এবং সমবিশ্বাসীদিগকে সেই শিশুত্ব লাভের জন্য উপদেশ দিলেন। এই ঢাকা নগরে নববিধান 'বিশ্বাসি-সমিতি'র শেষ অধিবেশনে কুচবিহারের মহারাণী শ্রীশ্রীমতী সুনীতি দেবী, C. I. সভা-নেত্রীর কার্য্য করেন। এ সময় আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র বেদী হইতে 'নবশিশু' বিষয়ে উপদেশ করেন। আমরা কেশবচন্দ্রের জীবনবেদে 'শিষ্য প্রকৃতি' আলোচনা-কালে বলিয়াছি, তাঁহার "শিষ্য-প্রকৃতিই শিশু-প্রকৃতি।" এই শিশু-প্রকৃতিকেই বঙ্গচন্দ্র চিরদিন অনুসরণ করিয়াছেন এবং যাহাতে পূর্ব্ববঙ্গে একটী বিশ্বাসী শিশুদল দাড়াইয়া পরম জননীকে মা মা বলে ডাকিয়া এবং তাঁহার আদিষ্ট ফুটফরমাইশ (কার্য্য) করিয়া ধন্য হয়, ইহাই তাঁহার 'নববিধানের ভাব সংস্থাপন'। 'ভাব সংস্থাপন' বলাতে সহজেই বুঝিতে হয় যে, জীবনের প্রতি ঘটনায় অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ নহে, কিন্তু ভাবে। কেন না ঈশার সুপ্রসিদ্ধ উক্তি আছে 'অক্ষর বিনাশ করে, আর ভাব জীবন দান করে।' শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্রের অনুসরণ করিলেন স্বাধীন ভাবে পবিত্রাত্মার দ্বারা পরিচালিত হইয়া, তাহাতেই তাঁহার কার্য্য হইল—'ভাব সংস্থাপন'। ইতি শম্।

পরিশিষ্ট (খ)।

নববিধানের নববিধান।

শিরো নামটী বিস্ময়জনক মনে হইতে পারে। কিন্তু চমৎকৃত হইবার কারণ নাই। কেন না শ্রীমদাচার্য্য বঙ্গচন্দ্র "নববিধানের নববিধান" এই বাক্য অনেকবার তাঁহার ধর্ম্ম বন্ধুদের নিকট ব্যবহার করিয়া, দেব নিশ্বাসে নিশ্বসিত হওয়া যে নিত্য নূতন, তাহা বুঝাইতে যত্ন করিয়াছেন। ঈশ্বর যেমন নিত্য বর্ত্তমান তেমনি তিনি নিত্য বাঙ্ময়। আমরা ব্রহ্মের জ্ঞান স্বরূপ প্রকাশের আলোচনায় ইহা দেখিয়াছি। আর্য্য ঋষিরা বলিলেন "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যৎ ঋগ্বেদঃ।" অর্থাৎ এই যে ঋগবেদ ইহা এই মহদ্‌ভূত ব্রহ্মের নিশ্বাসে নিশ্বসিত। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে শুধু ঋগ্‌বেদ নহে, বাইবেল, কোরাণ, আবেস্থা, ললিত বিস্তর প্রভৃতি সমুদয় ধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রবক্তা স্বয়ং ঈশ্বর এবং তিনি যেমন সনাতন পুরুষ তেমনি তাঁহার বাণীও চিরদিনই আছে। এই যে জীবন্ত ঈশ্বরের বাণী নিত্য, তাহা লক্ষ্য করিয়া মহাত্মা কারলাইল লিখিলেন—"Everlasting Nay and Everlasting Yea." অর্থাৎ "চিরন্তন না" এবং "চিরন্তন হাঁ"। গঙ্গার স্রোত হিমালয় পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া লক্ষ লক্ষ শতাব্দী যাবৎ সাগর সঙ্গমে মিলিত হইতেছে। তাহার স্রোতের বেগ কখনও হ্রাস হয় না, কোথাও থামে না। এইরূপ পরব্রহ্মের ধ্বনি কখনও বন্ধ হয় না। বেদ বেদান্তে

আর্য্যগণ, বাইবেলে যিহুদি ও খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বিগণ, কোরাণ সরিফে মুসলমানগণ, এবং ললিতবিস্তরে বৌদ্ধগণ ধর্ম্মের অনুশাসন সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শুধু ব্রহ্মবাদিগণ বলিতেছেন ঃ—

ব্রহ্মের পবিত্র ধাম বিশাল ভুবন।
চেতঃ পূত তীর্থ সত্য শাস্ত্র সনাতন॥
বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল, প্রীতি যে সাধন।
বৈরাগ্য, ত্যজিলে স্বার্থ, কহে ব্রাহ্মগণ॥

এই যে 'সত্যই সনাতন শাস্ত্র' একমাত্র ঈশ্বরই গুরুরূপে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন। এজন্য কোরাণ সরিফে বলা হইল ঃ—

Is there any of your companions who directeth unto the truth? Say, God directeth unto the truth.

—Chap. X.

অর্থ। তোমাদের সহচরদিগের মধ্যে কি কেহ তোমাদিগকে সত্যের পথে লইয়া যায়? বল, ঈশ্বরই সত্যের পথে লইয়া যান।

ব্রাহ্মগণ যদি এই জীবন্ত ঈশ্বরের বাণীতে প্রত্যাদিষ্ট না থাকেন তাহা হইলে তাঁহাদের ধর্ম্মও অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় মৃত ও পুরাতন হইয়া পড়িবে। আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পরিষ্কার করিয়াই বলিলেন 'পূর্ণ ধর্ম্ম ভবিষ্যতে।' তিনি আরও পরিষ্কার ঘোষণা করিলেন, Am I an Inspired Prophet? No. অর্থাৎ 'আমি কি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন? না।" ইহা কি আশ্চর্য্য কথা? যিনি ঘোর জড়বাদ, ইন্দ্রিয় পরায়ণতা, এবং স্বেচ্ছাচারিতার যুগে

নূতনভাবে দেবনিশ্বাসে নিশ্বসিত হইলেন এবং জীবন্ত ঈশ্বরের বল-পূর্ণ বাণীতে পূর্ণ হইয়া প্রত্যাদিষ্ট প্রবক্তারূপে সভ্য জগৎকে বিস্ময়াবিষ্ট করিলেন, তিনি বলিলেন "আমি প্রত্যাদিষ্ট মহাজন নহি।" এরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে **নববিধানে** কেহ মুসা, ঈশা, মহম্মদ প্রভৃতির ন্যায় প্রত্যাদিষ্ট প্রবক্তারূপে শীর্ষস্থান প্রাপ্ত হইবেন না। ব্রহ্মানন্দের জীবন-বেদের ষোড়শ অধ্যায়ে এ বিষয়ের পরিষ্কার মীমাংসা আছে। কেন না এখানে ছোট বড় প্রত্যেক বিশ্বাসীই ঈশ্বরের প্রেরণা প্রাপ্ত হইয়া কথা বলিবেন এবং কার্য্য করিবেন। তাহাতেই নববিধানের নবীনত্ব থাকিবে। এই নববিধান যে চির নূতন তাহা শুধু প্রত্যাদেশেই নূতন নহে—In Devotion and Inspiration. ভক্তি এবং প্রত্যাদেশ এই দুইটীতে নব-বিধান নূতন থাকিবে। এজন্য আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনায় বলিলেন 'নব বৃন্দাবনের ফুল নিত্য সতেজ।' নববিধানের নবীনত্ব যাহাতে চিরদিন থাকে তজ্জন্য আচার্য্য কেশব চন্দ্রের অনুসরণে শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রও চিরদিন যত্ন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা নববিধানে স্বাধীনভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার প্রত্যাদেশ গ্রহণ না করিবেন, অথচ আচার্য্য কেশবচন্দ্রের বক্তৃতা, উপদেশ, ও প্রার্থনাদি হইতে আপন আপন ভাব রুচি এবং বিচার অনুসারে সত্য গ্রহণ করিবেন ও প্রচার করিবেন, তাঁহারা নববিধান পুরাতন করিয়া তুলিবেন। কেন না হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীষ্টান ও য়িহুদি প্রভৃতি ধর্ম্মাবলম্বীদের ন্যায় তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িবে। এ সম্বন্ধে আচার্য্য বঙ্গচন্দ্রের একটী বিশেষ

শিক্ষা এখানে উল্লেখ করিয়া আমাদের কথা আরও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র এক সময় ধর্ম্ম বন্ধু দিগকে বলিলেন ঃ—ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ শুনিয়া চলিবার দুইটী প্রণালী হইতে পারে। যথা ঃ—

১ম। প্রতি বিশ্বাসী আচার্য্য বা উপাচার্য্য যাহা ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ পাইয়া প্রকাশ করিলেন, নিঃসংশয় চিত্তে আশা ও বিশ্বাস পূর্ণ মনে তাহা গ্রহণ করা এবং তদনুসারে চলা। কিন্তু ইহা প্রকৃষ্ট পন্থা নয়। প্রকৃষ্ট পন্থা যথা ঃ—

২য়। প্রতি বিশ্বাসী স্বাধীন ভাবে, জীবন্ত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওতঃ স্বীয় অন্তরে তাঁহার প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। যেখানে বিশ্বাসিগণ সমানান্তর ভাবাপন্ন এবং যেখানে তাঁহারা আশা ও বিশ্বাসের সহিত এক বিষয়ে সকলে প্রত্যাদেশ প্রতীক্ষা করেন, সেখানে সকলে এক প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত হন। তাহার একটী দৃষ্টান্ত এই ঃ—

"এক সময় (সম্ভবতঃ ১৮৮৩ খৃঃ অব্দে) অগ্রহায়ণ উৎসবান্তে কার্ত্তিক বারুণির মেলাতে প্রচার যাত্রা করা হইবে কি না এই প্রশ্ন উপস্থিত হইলে আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র প্রচারক বন্ধুদিগের প্রতিজনকে এ বিষয়ে প্রত্যাদেশ লাভের জন্য যত্ন করিতে বলিলেন। উপস্থিত প্রচারকগণ সকলেই আপন আপন অন্তরে ভগবৎ প্রেরণা পাইবার জন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন। নিস্তব্ধভাবে কিছুকাল অতিবাহিত হইল। অতঃপর একজন বলিলেন—"হাঁ, প্রচার যাত্রা কর' শুনিতেছি। কিছুকাল পরে শ্রদ্ধেয় ভাই ঈশানচন্দ্র বলিলেন 'হা প্রচার যাত্রা কর,' শুনিতেছি। অন্যান্য বন্ধুরাও ক্রমে ক্রমে তাহাই বলিলেন। এইরূপে প্রচারক

ভ্রাতৃগণের সকলেই এক প্রত্যাদেশ পাইয়াছেন শুনিয়া শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের আনন্দের সীমা রহিল না, তখন তিনি বলিলেন, তবে প্রচার যাত্রায় উদ্যোগ করিয়া আগামী কল্য প্রচার যাত্রা করা যাউক।,,

আচার্য্য বঙ্গচন্দ্র নববিধানের নূতনত্ব রক্ষার জন্য চিরদিন এই প্রণালী অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহাকে কেহ কোন প্রশ্ন করিলে, তিনি প্রথমতঃ বলিতেন, এ প্রশ্নের উত্তরে, তুমি তোমার স্বীয় অন্তরে কি আলোক পাইতেছ তাহা প্রকাশ কর। প্রশ্ন কর্ত্তা স্বীয় অন্তরের আলোক প্রকাশ করিলে দেখা যাইত, তিনি সম্যক্ উত্তর না দিলেও আংশিক ভাবে প্রশ্নের সুন্দর মীমাংসার কথা বলিতেছেন। তখন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র উপস্থিত অন্যান্য বন্ধুকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেন। অতঃপর সর্ব্বশেষে তৎসম্বন্ধে দেবালোকে আপনি মীমাংসা করিতেন। শিখ ধর্ম্মশাস্ত্রে আছে "সভ মহি জোত জোত হৈ সোই।" অর্থাৎ "সকলের মধ্যে যে জ্যোতি তাহাই তাঁহার জ্যোতি।" শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র এইরূপ সকলের মধ্যে ঈশ্বরের প্রকাশ দেখিতেন। তিনি যে কিরূপ নিত্য নূতন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া কার্য্য করিতেন তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা এই প্রস্তাব শেষ করিতেছি।

এই প্রবন্ধ লিখক ১৯০৮ হইতে ১৯১৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর কাল ঢাকার দাস মণ্ডলী হইতে শারীরিক ভাবে স্বতন্ত্র হইয়া কুচবিহার এবং কলিকাতাতে অবস্থিতি করেন। পাঁচ বৎসর পরে ঢাকাতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্রের কর্ম্মোদ্যম এবং দৈনিক উপাসনাতে জীবন্ত নূতন ভাব, কিছু মাত্র

হ্রাস তো হয়ই নাই, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও উৎসাহ সহকারে চলিতেছে। এ সময় তিনি স্বয়ং অন্ধ হইয়াছেন, মস্তকে একটী ক্লেশকর বেদনা প্রায় সর্ব্বদাই লাগিয়া রহিয়াছে। এই অবস্থার মধ্যে একটী সহকারী বন্ধু তাঁহাকে ইংরেজি পত্রিকা পাঠ করিয়া শুনাইতেন। বঙ্গচন্দ্র তাহা শ্রবণানন্তর নূতন প্রবন্ধ রচনা করিয়া স্বীয় ভাষায় ব্যক্ত করিতেছেন এবং সহকারী বন্ধু তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া 'The East' নামক পত্রে প্রকাশের জন্য প্রিণ্টারের হস্তে অর্পণ করিতেছেন। দৈনিক উপাসনার গৃহ নাই (১), দৈনিক উপাসনার পূর্ব্বের ন্যায় সমবেত জমাট ভাবও নাই (২) তথাপি বঙ্গচন্দ্রের উপাসনাতে জীবন্ত অনুরাগ ও নিষ্ঠা কিছু মাত্র কমে নাই। এ সময় তাঁহার প্রার্থনান্তে ভাই দুর্গানাথ গাইতেছেন ঃ—

পাগলাসুর—একতালা।

(তোমার) আমি আছি ধ্বনি। তুমি শুনাও জীবে দিন রজনী।

কি সম্পদে কি বিপদে, সুখে দুঃখে অবিচ্ছেদে; বলিছ অমৃত কথা মৃত প্রাণ সঞ্জীবনী।

(১) নিমতলীর বিধানপল্লীস্থ দেবালয় ইঃ বেঃ গবর্ণমেণ্ট পল্লীসহ গ্রহণ করেন।

(২) ভাই বৈকুণ্ঠনাথ কলিকাতা। ভাই শশিভূষণ মল্লিক কিছু দিন কাশীতে স্থিতি করিয়া পুনরায় খিলগাঁয় বাড়ী করিয়াছেন। ভাই অন্নদাপ্রসন্ন ও রাইচরণ পরলোকে। দৈনিক উপাসনাতে ভাই ঈশানচন্দ্র এবং ভাই দুর্গানাথ ও মহিমচন্দ্র এবং সময় সময় বন্ধু গোবিন্দচন্দ্র দাস ও আরও দুই একটী বন্ধু থাকিতেন।

আমিত্বের শূন্য ঘরে, থাকিবে জীব কি করে, তাই এসেছ তুমি আপনি,; খুলে সকল বন্ধন, প্রমুক্ত করে জীবন, দিতেছ জীবের শিরে চরণ পরশমণি।

প্রতিজনে হব তোমার, বল্‌ব তোমায় আমার আমার, প্রেমই হবে দলের বন্ধনী; আমরা তোমার মোদের তুমি, এই ত স্বর্গের ভূমি, অনন্ত জীবন স্বামী, প্রেমধনে কর ধনী।

সত্য জ্যোতি অমৃতেতে, আপনি এসেছ নিতে, জীবের প্রতি দয়া এমনি; সত্যের জয়, প্রেমের জয়, প্রতিষ্ঠা কর্‌বে দয়াময়, নববিধানের বিজয়, দেখিবে নিশ্চয় ধরণী।

সগরবংশ উদ্ধারিতে, পাঠাইলে অবনীতে, গঙ্গাধারা পতিত পাবনী; এবার সেইরূপে হরি, ঢালি শুদ্ধ ভক্তিবারি, দেখাও মহিমা তোমারি অনন্ত গৌরব খনি।

নববিধানের জীবন্ত নূতন ভাব রক্ষার জন্য আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ প্রার্থনা করিলেন :—(দৈঃ প্রাঃ ৪র্থ ভাঃ ৪৮ পৃঃ)।

হে পরিত্রাণের মূল, ত্বরায় পবিত্রাত্মা প্রেরণ কর। আমরা যে শুনিলাম মানিলাম তৃতীয় বিধান নববিধান পবিত্রাত্মার বিধান। এতে ভগবান্, তুমি তো বড় হবে না, তোমার সাধুরা তো বড় হবেন না, সে সমুদায় পুরাতন বিধান। গুরুর কাছে পড়ে থাকা, গুরুর সঙ্গে ঘুরে বেড়ান, কাণার মত গুরুর পথ ধরা, সে ঢের পৃথিবী দেখেছে। দ্বিতীয়েতে কুলাইল না তাই তৃতীয় বিধান আসিল। মানুষ নাকি তোমায় মেনেও, তোমার সাধুদের মেনেও ভিতরে ভিতরে সংসারে লিপ্ত রহিল, তাই ঘুঘু আসিল—পবিত্রাত্মা আসিলেন। হে ঈশ্বর, স্বর্গ থেকে তাঁকে পাঠায়ে দাও। হে মহর্ষি ঈশা, তুমি যে বলে গিয়েছিলে,

পবিত্র আত্মাকে পাঠাবে। তুমি যা করিতে পারিলে না, তা পবিত্র আত্মা আসিয়া করিবেন। এবারকার গুরু সে, যে বলে আমার কথা কিছু শুনিও না, আমার শিক্ষা মানিও না, যদি না পবিত্র আত্মার সহিত মিলে বুঝিতে পার। মা, আমরা এবার কপোতের দল হইব। বিধান-তন্ত্রী কৈ? এবারকার বিধান দাও না? তুমি দয়া করে পবিত্র আত্মার আগুণ দাও। যে আগুণে কাম ক্রোধ সব রিপু পুড়ে যাবে। যে ভগবানকে ধরিল, খুব বাড়াইয়া ডাকিল, লম্বা লম্বা প্রার্থনা করিল, আবার যে তোমার সন্তানকে ধরিল, সে আরও বাড়াইল তাঁদের। এ দুইয়ের কেউ স্বর্গে যেতে পারিল না। তুমি যে বলেছ কেবল তোমার পূজা করিলে কেহ স্বর্গে যেতে পারিবে না, তা হলে ত য়িহুদিরা স্বর্গে যাইত। তাই তুমি তৃতীয় বিধান নববিধান সাজিয়ে পাঠালে। মা, ভগবতী, পবিত্রাত্মার আকারে না এলে এবার বাঁচিব না। এবার গুরু যিনি, উপদেষ্টা যিনি, চাকর যিনি, বলে দিয়াছেন যে এবার সন্তানকে বড় করা হবে না। পবিত্রাত্মাকে বড় করিতে হইবে। আলোক তুমি এস, অগ্নি তুমি এস, ব্রহ্মাগ্নি তুমি ভিতরে না আসিলে রিপু কিছুতে যাবে না। পিতা, তুমি নিজেই বলিলে আমাকে কেবল ডাকিলেও পরিত্রাণ পাবে না। আপনি পেছিয়ে গেলে, গিয়ে পবিত্রাত্মাকে পাঠায়ে দিয়ে বলিলে, তুমি এবার রাজ্য কর। এবার ব্রহ্ম ব্রহ্ম হাজার বার বলিলেও কিছু হবে না, আর সাধুদের জুতো নিয়ে টানাটানি কল্লেও কিছু হবে না। পবিত্রাত্মার অগ্নিতে পাপ রিপু সব পুড়ে গিয়ে নূতন ভাব নূতন রুচি নূতন শুদ্ধ জীবন, নূতন তেজ উৎসাহ হবে এটা চাও ভগবান্! মিছামিছি জগদীশ্বর জগদীশ্বর না বলিলে পবিত্র আত্মা আসিবেন। তুমি একটু সরে দাড়াও ভগবান্। পবিত্র আত্মা কপোত আসুন, শরীর ধর, ধূ ধূ করে পুড়ুক। নূতন অগ্নি, অগ্নি যিনি তিনিই জল হয়ে ভক্তদের বাঁচান। তার ভিতর

ভগবান্ ও তাঁর সন্তানেরা সকলেই এয়েছেন—একে তিন তিনে এক। দীনদয়াল প্রেমসিন্ধু, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, পবিত্র আত্মার চরণে শরণাগত হইয়া যেন নববিধান পূর্ণ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

উল্লিখিত প্রার্থনা হইতে সুধীগণ বুঝিতে পারিবেন শ্রীমদ্বঙ্গচন্দ্র কিভাবে **নববিধানের নববিধান** শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ইতি—

পরিশিষ্ট সমাপ্ত।